ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৫২ সংখ্যা ।। ৬ ভাদ্র ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ২৩ আগষ্ট, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

শুধু জালনোট নয়, জাল মুদ্রারও ছড়াছড়ি দিল্লীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। এতদিন 'জাল নোট'-এর কথা জানা থাকলেও সম্প্রতি জাল মুদ্রা বা ফেক কয়েন-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। নেপালে তৈরি দশটাকা মূল্যের জাল মুদ্রা (কয়েন) দিল্লীর বাজার ছেয়ে ফেলেছে। পুলিশী সূত্রমতে দিল্লীর বাজারে চালু এই জাল

মুদ্রার মূল্যমান দেড় কোটি টাকার মতো। চোরাকারবারীরা নেপালে তৈরি এই কয়েনের বিপুল সম্ভার ফলের ট্রাকে অথবা ট্রেনে কাঠের বাক্সে ভরে দিল্লীতে নিয়ে আসছে। সম্প্রতি দিল্লী পুলিশের হাতে বামাল সমেত ধরা পড়েছে দুই চোরাকারবারী। দিল্লীর লোদী কলোনীর মেহের চাঁদ মার্কেটে পুলিশ সুধীর কুমার (৩৬) এবং দলীপ কুমারকে (২৯) ৪১,৬০০ টাকা মূল্যের কয়েনসহ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের অনুমান ইতিমধ্যে অন্ততঃপক্ষে দেড় কোটি টাকার জাল দশ টাকার ভারতীয় মুদ্রা দিল্লীর বাজারে ঢুকে পড়েছে।

ছোট বড় সব দোকানেই খুচরোর প্রয়োজন। আর তারই সুযোগ নিয়েছে চোরাকারবারীরা। জাল মুদ্রা বাজারে চালিয়ে জালিয়াতরা একটি মারুতি ৮০০ গাড়ীও কিনেছিল। কেননা লক্ষ লক্ষ টাকার মুদ্রার ওজন তো কম নয়। গাড়ীটির নম্বর ছিল ব্যতিক্রমী এবং বিরল। সেই গাড়ীও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। গাড়ীতে আবার পুলিশের ব্যবহার্য স্টীকার সাঁটা ছিল। ধৃত সুধীর কুমার রাজধানীর উত্তম নগরের বাসিন্দা, ধৃত অন্যজন দলীপ কুমার বিহারের মধুবনী জেলার বাসিন্দা বলে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে।

দিল্লী পুলিশের ডেপুটি কমিশনার এইচ জি এস ধালিওয়াল জানিয়েছেন, লোদী কলোনীর পুলিশের কাছে বাজারে চালু দশ টাকার কয়েন বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে কয়েকজন ব্যবসায়ী অভিযোগ করেছিলেন। তার ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। খুচরো নিয়ে নোট দেওয়ার ফাঁদে ফেলে দুষ্কৃতীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ আরও জানতে পেরেছে—নেপালের কয়েকটি স্থানে ওইসব নকল কয়েন তৈরি হয়।

(এরপর ৪ পাতায়)

রাজ্যবাসীর মাথায় ঋণের বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা।। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার সময় রাজ্যবাসীর মাথায় বিশাল ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার। চলতি আর্থিক বছরের শেষে এই ঋণের বোঝা দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকার মতো। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় আসে সে সময় মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪০৬ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার মতো। এর মধ্যে কেন্দ্রের কাছে ঋণের পরিমাণ ১০০৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। এর পরের বছর কেন্দ্রের কাছে ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৫২৪ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। ২০১০-এ কেন্দ্রের কাছে ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৯০৫ কোটি টাকা। শুধু কেন্দ্রের কাছে নয়, একই ভাবে বাড়ছে বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার কাছ থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ। এছাড়া বাজার থেকেও বহু অঙ্কের টাকা তুলেছে রাজ্য সরকার। সেই ঋণ শোধ না করায় আগামী বছর রাজ্যের ক্ষমতায় যারাই আসবে তাদের ঘাড়েই এই ঋণের বোঝা চেপে বসবে। আগামী বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলেরই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আসার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী সরকারও যাতে কেন্দ্র ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে না পারে সেজন্য বিধানসভায় আর্থিক দায়বদ্ধতা বিল আনতে চলেছে সরকার। এই বিল চালু হলে আর্থিক ঘাটতি মেটাতে রাজ্য সরকার আর যথেচ্ছ ঋণ নিতে পারবে না এবং ঋণ শোধ করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দায়বদ্ধতা মেটাতে গেলে পরের বছরগুলিতে রাজ্য সরকার কোনও উন্নয়নমূলক কাজই করতে পারবে না। বস্তুত সরকার পরিবর্তন হলে পরবর্তী সরকার যাতে কোনও উন্নয়ন মূলক কাজ না করতে পারে সেজন্যই এই ব্যবস্থা। বছরছয় পূর্বেই কেন্দ্র ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যথেচ্ছ ঋণ নেওয়া বন্ধ করতে রাজ্য সরকারগুলিতে আর্থিক দায়বদ্ধতা আইন চালু করতে বলেছিল কেন্দ্র। দেশের ২৬টি রাজ্যে আর্থিক শৃঙ্খলা আনতে এই আইন বহু আগেই কার্যকর

আর্থিক বছর	কেন্দ্রীয় ঋণ (কোটি)	বাজার ঋণ (কোটি)	মোট ঋণ (কোটি)
৩১ মার্চ ১৯৭৭	১০০৯,০৫	১৪০,৩৮	১৪১১,৪৮
৩১ মার্চ ১৯৮৭	৩৯২৬,৫৯	৫৬৬,২৬	৫৭০৭,১১
৩১ মার্চ ১৯৯৭	১৩৪৯৮,১০	৩২১৯,০৭	২২০৩৪,৯৯
৩১ মার্চ ২০০৭	১৪৭৮৪,১১	২২৬১২,৫১	১২০৮৯১,৬১
৩১ মার্চ ২০১০	১২৯০৫,৩৮	৫৯৯১০,৩৬	১৬৯৭৫৫,৬১
৩১ মার্চ ২০১১ (প্রাক্ হিসেব)	১৩০০৬,১৩	৭৩৭১৩,৯৯	১৯৯২৪৯৯,৭৭

হয়েছে। ত্রিপুরা ও কেরলে ৭ বছর আগেই এই আইন চালু হয়েছে। ব্যতিক্রম ছিল একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যটাকে আর্থিক ভাবে ফোঁপরা করে আগামী দিনে যাতে আর কেউ উন্নয়নের কাজ না করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার। রাশি রাশি ঋণ করেও রাজ্যের কোনও উন্নয়ন হয়নি। উন্নয়নে দেদার টাকা খরচ করেও পরিকল্পনার অভাবে সুফল পায়নি মানুষ। অর্থাৎ যে যে কারণে উন্নয়ন-মূলক প্রকল্পগুলি চালু করা হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে।

সদ্যপ্রকাশিত ক্যাগ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে সরকারি কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হলেও তার সুফল পায়নি রাজ্যবাসী। যেমন— জেনারেটর আছে কিন্তু তেল কেনার টাকা নেই। তাই পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি ও বীরভূমের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মোট ৪৮টি জেনারেটর দু'বছর ধরে স্রেফ পড়ে নষ্ট হচ্ছে। ২০০৭ সালে বীরভূম জেলার ফুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হয় সহায়ক সেবিকাদের জন্য বাড়ি তৈরি করতে। মজার ব্যাপার, ক্যাগের সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে— এই টাকায় সংলগ্ন এলাকায় নাকি পানীয় জল সরবরাহের কাজ করা হয়েছে। এজন্য কোনও অনুমোদন নেওয়া হয়নি। বিভিন্ন জেলায় ২৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভেঙে যাওয়া কর্মী আবাসে গ্রামবাসীরা খড় ঘুঁটে জমা রাখতে ব্যবহার করে। অথচ এ ব্যাপারে কেন্দ্রের টাকা অন্য খাতে খরচ করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির ৩টি, পুরুলিয়ার ৩টি এবং বীরভূমের ৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসক ও কর্মীর অভাবে ১৪ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি মরচে ধরে নষ্ট হচ্ছে।

মমতাকে হত্যার অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায়?

গূঢ়পুরুষ।। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে সি পি এম— এই অভিযোগে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলনে পথে নেমেছে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। থানা ঘেরাও থেকে মহাকরণের সামনে জমায়েত স্লোগানবাজি সবই হয়েছে।

এমনটি হওয়ারই কথা। কারণ, হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগটি খোদ তৃণমূল নেত্রী সম্মুখে করেছেন। নেত্রীর নির্দেশেই বিক্ষোভ আন্দোলনে পথে নেমেছে দলীয় সমর্থকরা। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এর আগে শাসকদলের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনও ব্যক্তিকে হত্যার গোপন ষড়যন্ত্র চলছে—

(এরপর ৪ পাতায়)

মাওবাদীদের সঙ্গে আই এস আই-এর যোগসূত্র দাউদ কোম্পানী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মাওবাদিদের সঙ্গে যোগাযোগের পথ সুগম করতে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই দাউদ কোম্পানীর যোগসূত্রকেই ব্যবহার করতে চাইছে। দেশের নিরাপত্তার সঙ্কটকে আরও ঘনীভূত করে এমনই মারাত্মক তথ্য হাতে এসেছে ব্যাঙ্গালোর পুলিশের। যদিও সংশ্লিষ্ট মহল এটাও স্বীকার করে নিচ্ছে যে, ব্যাঙ্গালোর পুলিশের হাতে যেটুকু তথ্য এসেছে তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। ঘটনার প্রকৃত গভীরতা আরও বিস্তৃত।

ব্যাঙ্গালোর পুলিশের দাবি, মাফিয়া ডন ছোটা শাকিলের গোষ্ঠীর এক সাকরেদের পরিকল্পনা তারা ভেস্তে দিতে পেরেছে। প্রসঙ্গত, যে ব্যক্তিটি দক্ষিণ ভারতে মাওবাদিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই অঞ্চলে নাশকতামূলক কাজ করবার ধান্দায় ছিল, তাকে এবং সেইসঙ্গে আরও চার দুষ্কৃতকারীকে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার করে ব্যাঙ্গালোর পুলিশ।

পুলিশী সূত্রের বক্তব্য, তাদের জেরা করে আলতাফ ওরফে রাকেশ-এর নাম উঠে এসেছে। আলতাফ ২০০৬ থেকে রেসিডেন্সী রোডের চার্চ টাওয়ারের টাইমস বারে একটি ব্যান্ডের দলে গাইত। এরই মধ্যে অপরাধমূলক কাজের জন্য কেরল পুলিশ আলতাফের বিরুদ্ধে অপহরণ ও রাহাজানির চার্জ আনে। বিপদ বুঝে দুবাই-তে পালায় সে। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজেও তার টিকিটি পায়নি। ভারত থেকে পালালেও রমানাথপুরের নকশালপন্থী বিনয় কুমারের সঙ্গে সে যোগাযোগ রেখে চলতো। বনসওয়াদী-র বারে একটা ঘটনায় পুলিশ বিনয় কুমারকে খুঁজছিল। ইতিমধ্যে আলতাফের সঙ্গে ছোটা শাকিলের সাক্ষাৎ হয় দুবাইতে। তখনই আই এস আই এবং মাওবাদী যোগাযোগের একটা ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়ে যায়। বিনয় এব্যাপারে মধ্যস্থতাকারী তৃতীয় পক্ষ হতেও রাজি হয়ে যায়।

বিনয় অন্ধ্রপ্রদেশে মাও যোগাযোগের ক্ষেত্রে আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে বেছে নেয় সেভাইয়া ওরফে শচীনকে। সেভাইয়ার

(এরপর ৪ পাতায়)

পিছাখালীতে গরু চুরিকে কেন্দ্র করে মৌলবাদী তৎপরতা

সংবাদদাতা।। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলী থানার পিছাখালী গ্রামে গরু চুরিকে কেন্দ্র করে মুসলিম মৌলবাদীরা ওই গ্রামে লুঠ-সন্ত্রাস ও অত্যাচার চালাবার জন্য উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয় সাহসী যুবকের তৎপরতায় তা ব্যর্থ হয়।

গত ১০ই জুলাই রাত্রে কয়েকজন গরু চুরি করতে আসে। যার গরু চুরি করে সে হাতে-নাতে একজনকে ধরে ফেলে। গ্রামের ছেলেরা চোরকে মারধোর করে থানায় খবর দেয়। থানার ওসি এসে চোরকে নিয়ে যায়। তারপর থেকে ঘটনা মোড় নেয় অন্য দিকে। মুসলিম দুষ্কৃতীরা প্রচার করতে থাকে যে তাদের একজন ভাল ছেলেকে চোর বলে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে প্রচুর মেরেছে এবং পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। এইভাবে অপপ্রচার করে আশপাশের মুসলিম গ্রাম ইছাখালী, খালপাড়, ৫নং, ৭নং, ৮নং, কচিয়ামারা ইত্যাদি গ্রামের মুসলিমদের সংগঠিত করে পিছাখালী গ্রামের চারদিকে জড়ো হয়। গ্রামের লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থানায় খবর দিলেও কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। তখন আর এস এসের স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা তাঁদের বারুইপুর জেলা অফিসে ফোন করে। জেলার কার্যকর্তা স্বরূপ দত্ত কুলতলী থানায় ফোন করতে পুলিশ এসে ডিউটি দেয়। কিন্তু পরদিন অবস্থা আরও ঘোরতর হয়ে ওঠে। দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে মুসলিম দুষ্কৃতীদের নিয়ে এসে জড়ো করা হয়। বেশ কয়েকশ' মুসলমান গ্রামের চারদিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়। শ্রীদত্ত আবার ওসি-কে ফোন করে পরিস্থিতি বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওসি গুজব বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এই নিয়ে শ্রীদত্তর সঙ্গে ওসি-র বচসাও হয়।

এদিকে স্বয়ংসেবকরা গ্রামবাসীদের নিয়ে অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়। গ্রামের মায়েরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে।

শেষপর্যন্ত ওসি পিছাখালী গ্রামে যান। গ্রামের মানুষজন এবং মায়েরা ওসি-কে ঘিরে অভিযোগ জানায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করেন ওসি, পুলিশ ডিউটি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তারপর বেশ কিছুদিন পুলিশ গ্রাম পাহারা দেয়। বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হলেও উত্তেজনার রেশ এখনও মিলিয়ে যায়নি।

আর এস এসের পক্ষ থেকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে 'শ্রীগুরুজী সমগ্র' অর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১০ আগস্ট সকালে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক পূজ্য স্বামী বুদ্ধানন্দজী মহারাজের হাতে 'শ্রীগুরুজী সমগ্র' (বাংলা, ১২ খণ্ড) রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার তরফ থেকে তুলে দেওয়া হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংস্কৃত ভাষাসহ সব প্রমুখ ভারতীয় ভাষায় 'শ্রীগুরুজী সমগ্র' মোট ১২ খণ্ডে অনূদিত হয়েছে।

এদিন সকালে সঙ্ঘের সর্বভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী, পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক নারায়ণ পাল, সনাতন মাহাতো ও সুকেশ মণ্ডল এবং সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র সম্পাদক বিজয় আঢ্য ও সহযোগী সম্পাদক বাসুদেব পাল বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয়ে যান। সেখানে প্রথমে স্বামী প্রণবানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

সঙ্ঘের পক্ষ থেকে শ্রী গোস্বামী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে স্বামী বুদ্ধানন্দজীর হাতে গ্রন্থগুলি অর্পণ করেন। প্রত্যুত্তরে স্বামী বুদ্ধানন্দ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গুজরাটের সুরাট আশ্রমের এক কার্যক্রমে শ্রীগুরুজীর উপস্থিতির স্মৃতিচারণা করে বলেন, শ্রীগুরুজীর ওইদিন কার্যক্রমের আগেই এসেছিলেন এবং শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ ছিলেন। সেদিন শ্রীগুরুজী 'সুন্দর, প্রাঞ্জল, দিগদর্শী ও প্রেরণাদায়ক' মার্গদর্শন করেছিলেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পক্ষ থেকে কার্যক্রমে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী, দিলীপ মহারাজ, স্বামী যুক্তানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী বুদ্ধানন্দের হাতে পুস্তক সমর্পণ করছেন সুনীলপদ গোস্বামী, বিজয় আঢ্য ও নারায়ণ পাল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মের সার্ধশতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির আয়োজনে গত ২ আগস্ট দু'টি বর্ণময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর অমলিন স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

পদযাত্রা

২ আগস্ট সকালে হাওড়ার সিস্টার নিবেদিতা স্কুল থেকে একটি বর্ণময় শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এতে ৫টি বিদ্যালয়ের দু'শোরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী উজ্জ্বল পোশাক পরিহিত হয়ে আচার্য রায়ের জীবন ও কর্মের ওপর তৈরি ব্যানার ও ছবি প্রদর্শনে অংশ নেয়। আগাগোড়া দেশাত্মবোধক সঙ্গীত গাইতে গাইতে শোভাযাত্রাটি জি টি রোড, ডবসন রোড ও সংলগ্ন প্রায় ৫ কিমি পথ পরিক্রমা করে।

আলোচনা চক্র

ওইদিনই দুপুরে সল্টলেকে ন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব্ আয়ুর্বেদিক ড্রাগ ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগে হিন্দু ঔষধি নিয়ে আচার্য রায়ের অবদানের ওপর একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। এতে প্রায় দু'শোজন প্রতিনিধি অংশ নেন। ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ও আয়োজক সমিতির সভাপতি ডঃ জয়রাম হাজরা বলেন, মানুষকে সুস্থ-সবল রাখার ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত প্রাচীন জ্ঞানের আধুনিক প্রয়োগে আচার্য রায় ছিলেন একজন পথ-প্রদর্শক। ইনস্টিটিউট অব্ হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজের নির্দেশক ডঃ চিত্তব্রত পালিতের মন্তব্য, 'আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের পর্বতপ্রমাণ কীর্তি 'এ হিস্ট্রি অব্ হিন্দু কেমিস্ট্রি' পৃথিবীর সামনে খুলে দিয়েছে আয়ুর্বেদের এক মহান জগৎ, যার মধ্যেই মানবসমাজ খুঁজে নিতে চাইছে মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার চাবিকাঠি। ডঃ সুভাষ মুখার্জী মেমোরিয়াল রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজি সেন্টারের সচিব এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও বায়োলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুনীত মুখার্জীর বক্তব্য, 'খাদ্যের ভেজালের ওপরই প্রফুল্লচন্দ্রের প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আয়ুর্বেদে খাদ্যের যে ওষুধ হিসেবে কার্যকারিতার কথা বলা আছে, 'A History of Hindu Chemistry'-তে আচার্য রায়-ই প্রথম তার ওপর দৃষ্টি আরোপ করেন'। অন্যান্যদের মধ্যে ন্যাশানাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব্ আয়ুর্বেদিক ড্রাগ ডেভেলপমেন্টের পরামর্শদাতা পি কে দেবনাথ, বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশনের সহকারী সম্পাদক রঞ্জন ঘোষ পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন। বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশনের সভাপতি ডঃ অর্চনা দত্ত মিশনের বিভিন্ন লক্ষ্য ও কর্মসূচীর দিকে আলোকপাত করেন। পারমাণবিক শক্তিবিভাগের পূর্বতন বরিষ্ঠ অধ্যাপক এন সি ভট্টাচার্যের লেখা 'আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও সমকালীন বঙ্গসমাজ' এবং অধ্যাপক পি কে দেবনাথের লেখা 'হিন্দু কেমিস্ট্রির ইতিহাসের পটভূমিকা ও উপাদান' এই গ্রন্থ দু'খানি প্রকাশিত হয়।

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মসার্ধশত বার্ষিকীতে সল্টলেকে আলোচনা সভা।

কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগারের পূর্বতন নির্দেশক ও কমিটির বর্তমান সচিব জে চক্রবর্তী তাঁর ধন্যবাদজ্ঞাপন বক্তৃতার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বক্তাদের বক্তৃতায় ধরা পড়েছে সাম্প্রদায়িক নামকরণের অজুহাতে 'এ হিস্ট্রি অব্ হিন্দু কেমিস্ট্রি'র নাম পরিবর্তনের চেষ্টা করছে কোনও কোনও মহল, আলোচনা-চক্রে উপস্থিত গুণীজন ও সুধী নাগরিকবৃন্দ এর তীব্র নিন্দা করেন।

গহনা যদি গড়াতে চান যে
কোনও স্বর্ণকারকে
প্রমান
ক্যাটালগ দেখাতে বলুন
সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স
১৫-ডি, গরাণহাটা স্ট্রিট, কলি -৬

এই সময়

স্ফীতিহীন মুদ্রাস্ফীতি

দীর্ঘ ৫ মাস প্রতীক্ষার অবসান। প্রথমবারের জন্য দু'অঙ্কের নীচে নামল মুদ্রাস্ফীতি। এক অঙ্ক ৯.৯৭ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে জুলাই মাসের মুদ্রাস্ফীতি। বাজার কিন্তু অগ্নিমূল্য। কেজি প্রতি ৩০ টাকার কমে খাদ্যযোগ্য চাল পাবেন না, ১২০ টাকার কমে মুগের ডাল পাবেন না। জনমানসে আশঙ্কা, অর্থনীতির কচকচানি থাকুক। আগামীদিনে এই অগ্নিমূল্য স্বাভাবিক মূল্য হিসেবে পরিগণিত হলে তাতে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।

দেউলিয়ার ভর্তুকি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে একটা দেউলিয়া সরকার এখবর সকলেরই জানা। সেই সরকারেরই হাতে এখন দেদার টাকা। মনের সুখে খরচ কর। অবাক হলেন বুঝি? আরে বাবা, বর্তমান সরকারের মেয়াদ আর একবছরও যে নেই সামনের বছর যারা আসবে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে যেতে হবে না! তাই ঋণের বোঝায় রাজকোষে যেটুকু আছে সব সাফ কর। বাস ভাড়া বাড়িও না। বাস-মিনিবাস এবং ট্যাক্সির জন্য ডিজেলে লিটার প্রতি ২ টাকা ভর্তুকি দাও। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি হলে তাতেও ভর্তুকির ব্যবস্থা কর। জনৈক নাগরিকের রসিকতা—'গিন্নী খেতে পান না নিজে, শঙ্করাকে ডাকে।'

নাটক বটে

হাওলা-গাওলার কোটি কোটি টাকার কারবারিরা কয়েক হাজার টাকার মাইনের ব্যাপারে গত ১৬ আগস্ট সংসদে কি কেলোর-কীর্তিটাই না করলেন! প্রসঙ্গ ছিল সাংসদদের তিনগুণ মাইনে বৃদ্ধি। সংসদের একাংশের অভিমত ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের 'কৃপা'য় সাধারণ মধ্যবিত্ত বাজার করতে গিয়ে দাম দেখে নাজেহাল, গরীব আধপেটা খাচ্ছে, এই অবস্থায় তাদের মাইনে বৃদ্ধি উচিত হবে না। আবার কারুর অভিমত, 'তা কেন?' সচিব পর্যায়ের যা মাইনে, পদমর্যাদায় আমরা তাদের থেকে উঁচু বলে তাদের চেয়ে অন্তত একটাকা বেশি মাইনে হওয়া উচিত আমাদের।' এই রঙ্গ দেখে এক সাংবাদিক বন্ধুর তির্যক কটাক্ষ— 'সাংসদরা হলেন সেই বাবা-মা যাঁরা তাঁদের মেয়ের বিয়ের জন্য চা-বাগানের মালিক পাত্রের চেয়ে চা-বাগানের ম্যানেজার পাত্রকেই চয়ন করে।'

নারী-শক্তি

নিজের পার্টিতে নারী-শক্তির জাগরণ নিয়ে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত বিজেপি সভাপতি নীতিন গড়করি। সংসদে মহিলা বিল নিয়ে উত্তেজনার ফাঁকেই গর্বিত গড়করি বলেছিলেন, 'আমরাই একমাত্র দল যারা তেত্রিশ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণের দাবি কার্যকর করতে পেরেছি দলের অভ্যন্তরেই।' এবার তাঁর গর্ব আরও বেশি। কারণ স্রেফ সংরক্ষণের জোরে নয়, নিজেদের যোগ্যতাতেই স্বমহিমায় দলে প্রতিষ্ঠিত মহিলারা। বিজেপি-র মহিলা মোর্চার সভানেত্রী স্মৃতি ইরানী তো আছেনই। এছাড়াও রয়েছেন নারীবাদী নেত্রী তথা সুপ্রিম কোর্টের দুঁদে আইনজীবী মীনাক্ষী লেখি। তিনি মহিলা মোর্চার সহ সভানেত্রী। তার ওপরে হেমামালিনী, নির্মলা সীতারামন সহ কিরণ খের সকলেই বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে।

মোদীর হুঁশিয়ারী

কাশ্মীর ইস্যুর প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্তমানে কাশ্মীরের অশান্ত পরিস্থিতির দরুণ বেশ উদ্বিগ্ন মোদী। গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ইউপিএ সরকার পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারকে এনিয়ে কঠোর সমালোচনা করেন তিনি। তিনি বলেন, কাশ্মীরের জঙ্গি সন্ত্রাস মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ কেন্দ্র। কেন্দ্রের এই ব্যর্থতার দরুণ বলি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের অক্ষমতার কথাও এদিন তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জঙ্গি দমনে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় যথেষ্ট গাফিলতি রয়েছে। তবে জঙ্গি দমনে কেন্দ্রের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর কথাও সাফ জানান গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী।

উত্তরপ্রদেশের নন্দীগ্রাম

নন্দীগ্রামের ছায়া এবার উত্তরপ্রদেশেও। বুদ্ধদেবের পর মায়াবতী। মুখ্যমন্ত্রী আলাদা হলেও উদ্দেশ্য কিন্তু আলাদা নয়। সম্প্রতি আলিগড়ের ঝিকারপুর গ্রামের জমি রিয়েল এস্টেট গড়ার স্বার্থে অধিগ্রহণ করে মায়াবতী সরকার। জমির মালিকদের পরিবার প্রতি ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের কথাও জানানো হয়। কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের দিন রাতে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের দাবিতে জমির মালিকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন সরকারের বিরুদ্ধে। আসলে জমির উর্বরতার নিরীখে ওই ক্ষতিপূরণ সামান্য বলেই মনে করছিলেন জমির মালিকরা। এর ফলাফলও হয় মারাত্মক, পুলিশের সঙ্গে জমিদাতাদের সংঘর্ষে মারা যায় ৪ জন ও আহত হয় ১ জন জওয়ান। প্রায় ২০০ জন কৃষিজীবি এই আন্দোলনে সামিল হন।

শীলা-শক্তি

স্বাধীনতা দিবসের দিন দিল্লিতে কমনওয়েলথ গেমস্ সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বিস্তর চক্কানিনাদ করলেও এ নিয়ে সরকারের অপদার্থতার কথাই বেফাঁস বলে ফেলেছেন দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত। ওই দিন আম্বেদকর স্টেডিয়ামে তিনি বলেন, "গত ৪ মাস যাবৎ কমনওয়েলথ প্রস্তুতি পর্বে দিল্লিবাসীর অসুবিধের দরুণ আমি সত্যিই অনুতপ্ত। তবে এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতারই প্রয়োজন।" ৬১ জন দিল্লির ক্রীড়াবিদ্ যে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে একথাও তিনি উল্লেখ করেন। রাজধানীর উন্নতির প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রায় ৮০০০ বাড়ি গরীব মানুষদের জন্য সরকারির তরফ থেকে তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও রাস্তাঘাট উন্নতির দিকেও যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। যদিও দিল্লীবাসীর অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথাই বলছে।

বুদ্ধর পথে

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পথের পথিক হলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। সম্প্রতি, রাজ্যের ১১টি জেলাকে খরাপ্রবণ ঘোষণা করেন বুদ্ধবাবু। সেই পথেই সমস্ত বিহারকেই খরাপ্রবণ ঘোষণা করেন নীতিশ কুমার। গত ১৫ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে যে চরম সংকটের মুখে রাজ্য পড়েছে, তার থেকে রাজ্যবাসীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উদ্ধার করার পরিকল্পনা চলছে। তবে এর দরুণ খাদ্য, পানীয়, কর্মক্ষেত্রে যাতে ভাটা না পড়ে সেটার দিকেও তিনি লক্ষ্য রাখবেন বলে জানান।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মার্কসবাদী ও মৌলবাদী

সাম্প্রতিক মুসলিম সন্ত্রাসের ঘটনা প্রবাহ হইতে কেরলের মার্কসবাদীরা সম্ভবত কোনও শিক্ষাই গ্রহণ করেন নাই। সন্ত্রাসের মামলায় অভিযুক্ত একজন মুসলিমকে গ্রেপ্তারের বিরোধিতা সিপিএম কেন করিতেছে তাহা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে? যদিও শেষ পর্যন্ত কর্ণাটক পুলিশ মাদানীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ঘটনা হইল, ২০০৮ সালের ব্যাঙ্গালোর বিস্ফোরণ মামলায় অভিযুক্ত পিডিপি-র চেয়ারম্যান আবদুল নাসের মাদানীকে গ্রেপ্তারের জন্য কর্ণাটকের একদল পুলিশ অফিসার গত ১০ আগস্ট '১০ কেরলে গিয়াছিলেন। জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারির পরোয়ানা হাতে থাকা সত্ত্বেও এবং বহু চেষ্টা করিয়াও তাহারা কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কর্ণাটক পুলিশের এই দলটির ব্যর্থতার কারণ কি? মাদানীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের সাহায্য করা হইবে বলিয়া তো কেরল সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু পরে কেরল সরকার তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে অসমর্থ বলিয়া যে যুক্তি দেখাইয়াছিল তাহা আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ, কিন্তু রাজনৈতিক চাতুর্য মিশ্রিত। কেরল সরকারের যুক্তি হইল— মাদানীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কর্ণাটক পুলিশের একটি দল কেরলে যাইবে—এই মর্মে কোনও অনুরোধ কর্ণাটক সরকার সরকারিভাবে তাহাদের জানায় নাই। কেরলের মার্কসবাদীদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে, কেননা যে সময় কর্ণাটকের পুলিশ দলটি কেরলে পৌঁছায়, তখন পরপর এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটিতে থাকে যাহার ফলে কেরল সরকারের বক্তব্যকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যেমন, সেইসময়েই রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল তিনদিনের সরকারি সফরে কেরলে গিয়াছিলেন। স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন অনুষ্ঠানও ছিল আসন্ন। ইহা ব্যতীত সন্ত্রাসবাদীদের হুমকি তো ছিলই। এইসবের মোকাবিলা তথা কার্যক্রমগুলির সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য বিশাল পুলিশবাহিনীকে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। কেরল পুলিশ এই ব্যাপারে আরও যে যুক্তি দেখাইয়াছিল, তাহা নিতান্তই হাস্যকর। রমজান মাসের আরম্ভের সময় মাদানীকে গ্রেপ্তার করা হইলে কেরলে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিন্তু কর্ণাটক সরকার নিজেদের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকিয়া স্পষ্টই জানাইয়া দেয় যে মাদানিকে গ্রেপ্তার করিয়াই তাহাদের পুলিশ দলটি প্রত্যাবর্তন করিবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে, অভিযুক্ত আই পি এস অফিসার টি জে থ্যাকেনকেরি (Thachankery) যিনি এখন কয়েক বছর ধরিয়া সাসপেন্ড এবং এন আই এ তদন্তাধীনে রহিয়াছেন। গত বছর তিনি ২০০৮-এ বোমা বিস্ফোরণের প্রধান অভিযুক্ত টি নাজিরের মামলাটি বন্ধ করিবার জন্য ব্যাঙ্গালোরে গিয়াছিলেন। এই বিষয়টিও লক্ষণীয় যে নাজিরের স্বীকারোক্তির সূত্র অনুযায়ীই মাদানীর নাম এই মামলায় নথিভুক্ত করা হইয়াছিল। ঘটনা হইল, মার্কসবাদীরা তখন কোনওভাবেই মাদানীর পিডিপি-র বিরোধিতা করিতে রাজী নয়, কেননা কেরলের মুসলিমদের মধ্যে একমাত্র এই মুসলিম গোষ্ঠীটিই এখন সিপিএমের সমর্থক। শুধু তাই নয়, মাদানীকে পরিত্যাগ করা সিপিএমের পক্ষে এখন সহজ নয়, কেননা গত লোকসভা নির্বাচনেপিডিপি-র সঙ্গে জোট বাধিয়াই তাহারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। মাদানী এই পরিস্থিতির মধ্যেই পিডিপি-র মতো একটি ফ্রন্ট গঠন করিয়াছে এবং তাহার গ্রেপ্তার প্রতিরোধ করিবার জন্য বহু সমর্থককে নিজের হেড কোয়ার্টারে জমায়েত করাইয়াছে। সাধারণ মানুষ খুব সঙ্গত কারণেই বিস্মিত হইবে যে মাদানী এমন এক বিখ্যাত ব্যক্তি যে আদালতের পরোয়ানা সত্ত্বেও তাহাকে গ্রেপ্তার করা যাইতেছে না। কিংবা পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনের কথা মনে রাখিয়া সিপিএম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তাস খেলিতেছে। মাদানী নিজের চামড়া বাঁচাইতে কী না কী ফাঁস করিয়া দেয়—এই আশঙ্কায় সিপিএম এখন তাহাকে ঘাঁটাইতে চাহিতেছে না বলিয়াও সমালোচকরা মনে করিতেছেন।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে ভারতের সর্বত্র একটা অশান্তির ভাবের উদয় হইয়াছে। সেই সঙ্গে আমাদের বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার অভাব মোচনকারী শতশত ঔষধ বা উপায়ও আবিষ্কৃত হইতেছে। উন্নতিকামীগণের ভিতর একদলের নাম সমাজসংস্কারক, ইহারা মনে করেন, ভারতবর্ষের কতগুলি প্রাচীন প্রথা ধ্বংস করিলেই মাতৃভূমির উন্নতি হইবে। সমাজ সংস্কারের জন্য এই দলের প্রবল উৎসাহ দেখিয়া বোঝা যায়, ভারতবর্ষ এখনও প্রাণহীন হয় নাই। ভারতের জীবন-দীপ যদি একেবারে নির্বাপিত হইয়া যাইত তাহা হইলে কি আর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘর্ষে সংস্কারস্বরূপ এই সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অভ্যুদয় হইত? আবার দেখা যায়, ওই দলের ভাসা ভাসা, উপর-উপরের সংস্কারের চেষ্টায় ভারতবর্ষ প্রাচীন যুগের ন্যায় এখনও বিচলিত নহে—তাহাতে কি ইহাই বুঝায় না যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ গভীরতা, গুরুত্ব ও সজীবতা এখনও প্রচুর পরিমাণে বর্তমান?

—ভগিনী নিবেদিতা

সংসদীয় গণতন্ত্রে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা কতটা পালন করতে পেরেছেন বুদ্ধবাবু?

নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

আমাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। অবশ্য সংবিধান তাঁকে লিখিতভাবে তেমন ক্ষমতা দেয়নি। এতে তাঁর সম্বন্ধে আছে মাত্র তিনটে অনুচ্ছেদ। প্রথমত, ১৬৩(১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— তাঁর নেতৃত্বে একটা ক্যাবিনেট থাকবে এবং তার কাজ হবে রাজ্যপালকে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়া। দ্বিতীয়ত ১৬৪ নং অনুচ্ছেদে আছে— তাঁরই পরামর্শে রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করবেন। আর তৃতীয়ত, ১৬৭ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, তিনিই ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য বিষয় রাজ্যপালকে জানাবেন।

অবশ্যই এইটুকু লিখিত ক্ষমতা নিয়ে কারও পক্ষে রাজ্য-প্রশাসনে বিরাট ভূমিকা নেওয়া যায় না। আসলে, এক্ষেত্রে পদের তুলনায় ব্যক্তিত্বই অনেক সময় বড় হয়ে ওঠে। বিধানচন্দ্র রায়, চন্দ্রভাস গুপ্তা, বিজু পট্টনায়ক, মোরারজী দেশাই প্রমুখ মুখ্যমন্ত্রীরা কর্তৃত্ব করেছিলেন ব্যক্তিত্ব, দূরদর্শিতা, নেতৃত্বগুণ ইত্যাদি দ্বারা।

এটা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সংবিধান ব্রিটিশ ধাঁচের শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করায় কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যে রাজ্যপালকে সাধারণত নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। সংবিধানের ১৫৪(১) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে অবশ্যই রাজ্যপাল রাজ্যের প্রধান শাসক— তাঁর নামেই শাসন চলে। ডঃ সুভাষ কাশ্যপ তাই মন্তব্য করেছেন —'All executive actions are to be taken in the name of the Governor'—(আওয়ার কন্‌স্টিটিউশান, পৃঃ ২১৫)। কিন্তু আমরা বৃটিশ পদ্ধতি গ্রহণ করায় রাজ্যপাল উপদেষ্টার ভূমিকা নিয়ে থাকেন— প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন ক্যাবিনেট—বিশেষত মুখ্যমন্ত্রী। এই কারণে ডঃ জে. সি. জোহারী মন্তব্য করেছেন। 'The Chief Minister is the real executive head of the State Government' —(ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ৭৩৭)।

সুতরাং বলা যায়—সাংবিধানিক ধারা ও অলিখিত প্রথার সংমিশ্রণে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য শাসনে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করে দেখতে হবে আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কতটা সফল।

প্রথমত, রাজ্যপালের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে একটা সহজ-স্বাভাবিক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। ব্যাপারটা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌজন্যবোধের। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যপালের অধীনস্থ কর্মকর্তা— সব মন্ত্রীরাই 'Officers sub-ordinate to him'(৭৪নং অনুচ্ছেদ)। তাঁকে সেই কারণে রাজ্যপালের আস্থাভাজনও হতে হয়।

বিধানচন্দ্র রায় দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজ্য চালিয়েছেন। কিন্তু তিনি ডঃ নরেন্দ্রকুমার মুখার্জী, পঙ্কজ নাইডু প্রমুখ রাজ্যপালের সঙ্গে একটা মধুর ও সৌজন্যসুলভ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন।

কিন্তু বুদ্ধ দেববাবু কি প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন? মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রান্ত, সর্বনাশা ও অজ্ঞতাপ্রসূত শিল্পনীতিকে আদৌ তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। বিভিন্ন ভাষণে তিনি বলেছিলেন, শিল্পের জন্য জোর করে কৃষিজমি দখল করা উচিত নয়। বিশেষ করে, ২০০১ সালের মার্চে মুখ্যমন্ত্রীর উর্দিধারী ও উর্দিহীন গুন্ডারা নন্দীগ্রামে যে নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছিল, তার তীব্র নিন্দা করে রাজ্যপাল বলেছিলেন—সেটা ছিল 'cold horror'। এতে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বোধোদয় বা লজ্জা হয়নি। হাইকোর্টও বলেছিল যে, সেই গুলি বর্ষণটা ছিল 'Wholly Unconstitutional।' অথচ তার পরেও নভেম্বরে পুলিশ পিকেট সরিয়ে আবার চালানো হয়েছিল বীভৎস তাণ্ডব। রাজ্যপাল মন্তব্য করেছিলেন, অমানবিক বীভৎসতায় দীপাবলীর সব আলো ম্লান হয়ে গেছে।

এগুলো যে একজন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি রাজ্যপালের অনাস্থা ও অশ্রদ্ধার লক্ষণ, সেটা ক্ষমতা উন্নত মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আদৌ বোঝেননি। আরও বড় কথা—গণতান্ত্রিক দেশে এমন বর্বরতার জন্য কারও শাস্তি হয়নি। এমন কি, মুখ্যমন্ত্রী এর দায় নিজের ওপর নিয়েছিলেন— কিন্তু নীতিবোধের অভাবের ফলে পদত্যাগ করেননি।

না, মার্ক্সবাদীরা দেহত্যাগ করেন, কিন্তু পদত্যাগ করেন না।

এই অবস্থায় অবশ্যই রাজ্যপাল তাঁর মুখ্যমন্ত্রীকে ১৬৪(১)নং অনুচ্ছেদ অনুসারে পদচ্যুত করতে পারতেন। রাজ্যপালের এই ক্ষমতা অবশ্যই আছে (শর্মা বনাম ঘোষ, ১৯৬৭)। আরও অদ্ভুত ব্যাপার হলো— তাঁর উদ্যোগে রাজভবনে সিঙ্গুরের কিছু কৃষিজমি ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে সরকার ও বিরোধীপক্ষের বৈঠক বসেছিল। রাজ্যপালকে মাঝখানে রেখে দুই পক্ষের একটা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী তারপর বিরোধী নেত্রীকে ধন্যবাদও জানিয়েছিলেন।

কিন্তু পরের দিনই মুখ্যমন্ত্রী ডিগবাজী খেয়েছেন। রাজভবনে নাকি চুক্তিই হয়নি। কোন সভ্য সমাজে অমনটা হয়?

এই ধরনের নেতাদের জন্য ইতিহাসের কিছু কথা বলতে হয়। ১৯৩৭ সালে বৃটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার স্যামুয়েল হোর ও ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী লাভালের একটি চুক্তি হয়েছিল সরকারী স্তরেই। চুক্তিটার বিষয়বস্তু প্রকাশিত হতেই ব্রিটেনের মানুষ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

"মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন—নন্দীগ্রামে পুলিশ এমনটা করবে—তা তিনি জানতেন না। কিন্তু তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর জ্ঞাতসারেই সব কিছু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছিলেন— বিরোধীরা খেজুরীর দিকে গুলি চালায়। কিন্তু স্বরাষ্ট্রসচিব জানিয়েছিলেন যে, তাঁর কাছে খবর আছে—গুলিগোলা আসে মূলত খেজুরীর (অর্থাৎ কমরেডদের) দিক থেকেই। অতঃপর মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে সরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এতে মুখ্যমন্ত্রীর মর্যাদা বেড়েছে কি?"

সরকারের পতন আসন্ন জেনে প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন তখন স্যার হোরকে অনুরোধ করেন ব্যক্তিগত ত্রুটি স্বীকার করে পদত্যাগ করার জন্য। ক্যাবিনেটকে রক্ষা করার জন্য স্যার হোর সেটাই করেছিলেন।

এক্ষেত্রে কিন্তু ক্ষমতালোলুপ মুখ্যমন্ত্রী বা শিল্পমন্ত্রী বিদায় নেয়নি। এটা শুধু রাজ্যপালের প্রতি অবমাননা নয়— রীতিনীতি ও ন্যায়বোধের প্রতিও চরম অবজ্ঞার নিদর্শন। বলা বাহুল্য, সুভদ্র এই রাজ্যপাল স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু সরে যাওয়ার কথা ছিল কার?

দ্বিতীয় বিষয়টা মুখ্যমন্ত্রী-ক্যাবিনেট সংক্রান্ত। ১৬৪(১) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মুখ্যমন্ত্রী হলেন 'Chief Minister' এবং তাঁর স্থান ক্যাবিনেটের শীর্ষে— 'at the head।' ১৬৫নং অনুচ্ছেদে আছে— তিনিই অন্যান্য মন্ত্রীদের মনোনীত করেন। আর ১৬৭নং অনুচ্ছেদ অনুসারে তিনিই ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য সংবাদ রাজ্যপালকে জানান।

সুতরাং বলা যায়— তিনি ক্যাবিনেটের মধ্যমণি—বৃটেনে বলা হয় 'Keystons of the cabinetarch' (লর্ড মর্লে)। তাঁকে ঘিরেই ক্যাবিনেটের উত্থান-পতন ঘটে। তিনি মন্ত্রীদের পরিচালিত করেন, সাহায্য করেন এবং ইচ্ছে মতো বরখাস্তও করতে পারেন। তাঁর সঙ্গে বিরোধ বা মতপার্থক্য ঘটলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বিদায় নিতে বাধ্য। ডঃ বিদ্যাধর মহাজনের ভাষায়— 'he who does not

(এরপর ৪ পাতায়)

মমতাকে হত্যার অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায়?

(১ পাতার পর)

এমনধারা অভিযোগে উত্তাল আন্দোলন অতীতে হতে দেখিনি। খুনের রাজনীতি কম্যুনিস্টরাই করে। এই ব্যাপারে মাওবাদী এবং মার্কসবাদীদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। কম্যুনিস্টরা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলায় ব্যর্থ হলে ব্যক্তি হত্যার পথ নিয়ে থাকে ইতিহাস এই কথাই বলে। তাই মমতার অভিযোগকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কোলাঘাটের কাছে মমতার কনভয়ের দুর্ঘটনাটি তাঁকে হত্যার চেষ্টা নাকি নিছকই সড়ক দুর্ঘটনা সেই রহস্য থেকেই গেছে।

প্রশ্ন উঠেছে, মমতার কনভয় কলকাতা ফেরার পথে কোলাঘাট সেতুর কাছে জাতীয় সড়কে চা পানের জন্য দাঁড়াবে এমন তথ্য ষড়যন্ত্রকারীদের আগেই জানা ছিল কি? কারণ, কনভয় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পিছন থেকে লরিটি ধাক্কা দেয়। ওইভাবে থেমে না থাকলে এমন দুর্ঘটনা ঘটা বা ঘটানো সম্ভব ছিল না। অতি দ্রুতগতিতে চলা ভি ভি আই পি কনভয়ের পিছন থেকে এসে বিশেষ একটি গাড়িকে টার্গেট করে ধাক্কা মারা লরি বা বাসের মতো ধীরে চলা ভারি গাড়ির পক্ষে সম্ভব নয়। যতদূর জানি ফেরার পথে কোলাঘাটের কাছে ধাবায় চা পানের ইচ্ছার কথা তৃণমূল নেত্রী হঠাৎই জানান। তাঁর ইচ্ছাতেই কনভয় দাঁড়িয়ে যায় এবং দুর্ঘটনাটি ঘটে। অর্থাৎ কনভয় যে কোলাঘাটে দাঁড়াবে এমন নির্দিষ্ট সূচি পুলিশের কাছে অগ্রিম ছিল না। তথাকথিত খুনের ষড়যন্ত্রকারীরা যদি কনভয়ের সামনের দিকে লরি বা বাস ঢুকিয়ে দিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটাতো তবে হয়তো বিশ্বাসযোগ্য হতো। কারণ, ভি ভি আই পি কনভয় দুরন্ত গতিতে কলকাতার পথে ফিরবে এমনটাই নির্দিষ্ট ছিল। এবং সেটাই সাধারণ নিয়ম। তাই প্রশ্ন থেকে যায় সত্যি কী কোলাঘাটের কাছে মমতাকে হত্যার ঘৃণ্য চেষ্টা হয়েছিল। অথবা ওটি নিছকই দুর্ঘটনা।

মনে রাখতে হবে দুর্ঘটনাটি ঘটার পরেই লরি চালক গুর্জর সিং পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সে জানায় ব্রেক ফেল করাতেই সে নিয়ন্ত্রণ হারায়। সড়ক দুর্ঘটনার পর সাধারণভাবে গাড়ির চালকরা এমন কথাই বলে থাকে। পুলিশের দাবি গুর্জরের লরির যান্ত্রিক পরীক্ষায় দেখা গেছে ব্রেক কাজ করছেনা। পাঞ্জাববাসী গুর্জর সিং দূরপাল্লার লরি চালনায় অভিজ্ঞ চালক। অতীতে সে কোনও দুর্ঘটনা ঘটায়নি। কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও তার সামান্যতম যোগাযোগ নেই। পুলিশের গোয়েন্দারা টানা সাতদিন জেরা করে নিঃসন্দেহ যে গুর্জর সিং বাংলার রাজনীতি সম্পর্কে ঘোর অজ্ঞ। কনভয়টি যে রেলমন্ত্রীর তা গুর্জরের জানা ছিল না।

প্রশ্ন উঠেছে, কনভয়ের ফেরার পথে গুর্জর লরি নিয়ে ঢুকে পড়েছিল কীভাবে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে জাতীয় সড়কে যানবাহন নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পুলিশের বড়সড় গাফিলতি ছিল। এমনকী ওয়্যারলেসে কনভয়ের দাঁড়িয়ে থাকার খবর স্থানীয় থানাকে জানিয়ে দেওয়ার পরেও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি। কেন? তৃণমূল নেতৃত্ব খোলাখুলি বলছেন মমতাকে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে হত্যার জন্যই যান নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি।

তা হলে ধরে নিতে হবে যে কনভয় জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে আছে খবর পাওয়ার পরেই পার্টির নির্দেশে স্থানীয় পুলিশ গুর্জরকে লরি নিয়ে দুর্ঘটনা ঘটাতে পাঠায়। অর্থাৎ হত্যার উদ্দেশ্যে সড়ক দুর্ঘটনাটি পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না। এটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য ভেবে দেখবেন।

লালগড়ে জনসভা করার কথা মমতা ২১ জুলাই ধর্মতলার দলীয় সমাবেশে প্রথম ঘোষণা করেন। সেদিন তিনি সি পি এমের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকলেও তাঁকেই হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা বলেননি। লালগড়ে যাওয়ার তিনদিন আগে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা প্রথম তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগটি প্রকাশ্যে জানান। কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যখন সংবাদ মাধ্যমের কাছে তাঁর খুন হয়ে যাওয়ার কথা বলেন তখন ধরে নিতে হবে মন্ত্রীর কাছে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে। তিনি জানেন কে বা কারা সেই হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। মমতা রেলমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তিনি প্রথম সারিতে বসেন।

স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উচিৎ প্রধানমন্ত্রীকে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তথ্য প্রমাণ জানিয়ে দেওয়া। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি মমতা আজও করেননি। কেন? সাংবাদিকদের কাছে 'আমি খুন হয়ে যেতে পারি' বিবৃতি দিয়ে রাজনৈতিক চমক সৃষ্টি করা যায়। বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করা যায় না। অনেকটা সেই রাখালের 'বাঘে ধরেছে' বলে মিথ্যা চিৎকারের গল্পের মতো। সত্যি যখন রাখালকে বাঘে ধরলো তখন কেউ তাকে বিশ্বাস করলো না। মমতা কি রাখালের করুণ পরিণতি থেকে কোনও শিক্ষা নেবেন?

শুধু জালনোট নয়

(১ পাতার পর)

তারপর বিহার সীমান্ত দিয়ে ভারতে আসে। সেখান থেকে কাঠের বাক্সে ভরে সবজির ট্রাকে অথবা রাজধানীগামী 'সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেসে' করে দিল্লীতে চালান করা হয়। ট্রেনে আবার কয়েন ভর্তি বাক্সগুলোকে গার্ডের কামরায় তোলা হয়। দিল্লীতে অন্ততঃপক্ষে দশজন এজেন্ট রয়েছে। তাদের মাথা হলো জনৈক মঙ্গত যোশী। একথা জানিয়েছেন একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অধিকারিক।

মাওবাদীদের সঙ্গে আই এস আই

(১ পাতার পর)

একটি নিরাপত্তা এজেন্সী ছিল কোডাগুর বিরাজপেট-এ। এছাড়া ঠিক সেই সময়েই পেশায় কফি চাষী দেভাইয়া মহীশূরের কাছে একটি জনজাতি উন্নয়ন সমিতি নামক সংগঠন গড়ে তুলেছিল। সংগঠনের ব্যাপ্তি নকশাল অধ্যুষিত ছত্তিশগড়েও বিস্তৃত ছিল। এরপর যা হয়, জনজাতি সংগঠনের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে মাওবাদীদের সঙ্গে দেভাইয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনে সমর্থ হয় আলতাফ, নেপথ্যে ছিল বিনয়। যদিও জল অনেকদূর গড়িয়েছে বলে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা।

সংসদীয় গণতন্ত্রে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা

(৩ পাতার পর)

obey him must quit'–•ðÉ কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃঃ ২৯৭)।

অবশ্য কোয়ালিশন-ক্যাবিনেটে মুখ্যমন্ত্রীকে অনেকটা সীমাবদ্ধ তার মধ্যে কাজ করতে হয়, কারণ সেক্ষেত্রে শরিক-দলের একটা ভূমিকা করবে। কিন্তু ডঃ অনুপচাঁদ কাপুর মনে করেন— তার মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রীকে যৌথদায়িত্ব রক্ষা করতে হয়, কিছুটা প্রাধান্য ও কর্তৃত্বও রক্ষা করতে হয়। জ্যোতি বসু ভিন্ন দলের যতীন চক্রবর্তীকে সরিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু কোনও কোনও মন্ত্রী বিভিন্ন ব্যাপারে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করেছেন, যৌথদায়িত্বের নীতি লঙ্ঘন করে তাঁর অনেক কাজের নিন্দা করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁদের সরাতে পারেননি, মুখ বন্ধ করারও ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

এটাও একটা বিরাট প্রহসন। তিনি কি তাহলে ক্যাবিনেটের 'হেড্'? সত্যিই তিনি 'কী-স্টোন্'?

তৃতীয়ত, তিনি সরকারের মুখপাত্র। তাঁর কথাতেই সরকারের নীতি প্রতিফলিত হয়, সরকারের প্রতিশ্রুতি ও কর্মসূচী তাঁর মাধ্যমেই মানুষ জানতে পারেন। ডঃ বি. সি. রাউত মন্তব্য করেছেন, 'He is the chief spokesman of the State Government. His utterances and assurances are deemed to be authentic and binding'—(ইন্ডিয়া ঃ ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ২২৭)।

কিন্তু এটা কি সত্যি?

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একবার সি বি আই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রকাশ্যে। আদালতে কিন্তু সরকার-পক্ষ তার বিরোধিতা করেছে—জানানো হয়েছে যে, এই ব্যাপারে সরকারের আপত্তি আছে।

তাহলে প্রশ্ন উঠবে— সরকারের প্রকৃত মুখপাত্র কে? মুখ্যমন্ত্রী, না কি সরকার-পক্ষের আইনজীবী? কোনও সুস্থ-স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থায় এমনটা হতে পারে? মুখ্যমন্ত্রীর শাসনব্যবস্থার পরিচালক—আমলা, অফিসার, কর্মচারী, পুলিশ ইত্যাদির শীর্ষে থেকে তিনি প্রশাসন চালিয়ে থাকেন। তিনি হলেন 'head of the services'—(ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ২৪৭)। সুতরাং অন্যান্য সরকারী ব্যক্তিরা তাঁর সুরের রেশ ধরবেন—এটা ধরে নেওয়া যায়, কারণ তাঁরা অধস্তন ব্যক্তি।

কিন্তু কি দেখছি আমরা?

মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন—নন্দীগ্রামে পুলিশ এমনটা করবে—তা তিনি জানতেন না। কিন্তু তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর জ্ঞাতসারেই সব কিছু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছিলেন— বিরোধীরা খেজুরীর দিকে গুলি চালায়। কিন্তু স্বরাষ্ট্রসচিব জানিয়েছিলেন যে, তাঁর কাছে খবর আছে—গুলিগোলা আসে মূলত খেজুরীর (অর্থাৎ কমরেডদের) দিক থেকেই।

অতঃপর মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে সরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এতে মুখ্যমন্ত্রীর মর্যাদা বেড়েছে কি?

কিছুদিন আগে তিনি বলেছেন, শিল্‌দায় যে মাওবাদী হানা হবে— সেটা গোয়েন্দা দপ্তর আগেই জানিয়েছিল। কিন্তু মুখ্যসচিব ও পুলিশের ডি জি এটা অস্বীকার করেছেন।

আরও আছে—স্টিফেন কোর্টের অগ্নিকাণ্ড নিয়ে তিনি বলেছেন, সেই বাড়িতে কিছু বেআইনী কাঠামো ছিল। কিন্তু মেয়র ও নগর-উন্নয়ন-মন্ত্রী ভিন্ন কথা বলেছেন।

তিনি তাহলে কি প্রশাসনের মুখ্য ব্যক্তি?

পঞ্চ মত, মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার নেতাও। ডঃ এস এল সিক্রি লিখেছেন, 'He is the leader of the House. He should see that the members of the Opposition are not gagged in the expression'—(ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ২৪৭)।

অথচ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ২৩৫/৩০-এর অহঙ্কারে বিরোধীদের প্রতি অদ্ভুত ধরনের অবজ্ঞা দেখিয়ে চলেছেন। সংসদীয় রাজনীতিতে এটা এক অকল্পনীয় ব্যাপার। সাধারণত নিম্নকক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর দল/গোষ্ঠীর গরিষ্ঠতা থাকে, সুতরাং তাঁকে সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। বিধানচন্দ্র রায় কিন্তু বিরোধী নেতাদের সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত ও সুস্থ সম্পর্ক রাখতেন, তাঁদের চিকিৎসাও করতেন।

বৃটেনে প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই বিরোধী নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। বিভিন্ন বিল্ রচনার ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নেন—অনেক সময় এমনভাবে বিল রচনা করা হয় যে, বিরোধীরা তাতে বাধাই দেয় না। স্যার জেনিংস্ মন্তব্য করেছে—'Many proposals of the Government are not opposed, because there is general agreement'—(দ্য কুইন্‌স্ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ৮৭)। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী নেতার এই সমঝোতা নিয়ে জর্জ বার্নার্ড স্ বলেছেন—'The Prime Minister Knows the Opposition-leader more than he does his own wife.'

কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী গরিষ্ঠতার গর্বে বিরোধীদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে থাকেন। অথচ গণতন্ত্রের অন্যতম নীতি হলো—সরকারের শাসন করার যেমন অধিকার আছে, বিরোধীদের আছে বিরোধিতার অধিকার।

সম্প্রতি তিনি কংগ্রেস নেতাকে বলেছেন, মেরুদণ্ড ঠিক রাখার জন্য, কারণ তৃণমূলের সঙ্গে সমঝোতা নাকি অনৈতিক ব্যাপার।

কিন্তু তাঁর দল এক সময় বিজেপি ও কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলায়নি? কেরালার মুসলীম লীগের সঙ্গে সমঝোতা করেনি? এক সময় এম এন রায় এই দলের জন্য মস্কো থেকে টাকা পাঠাতেন। তার সবটা নেতারা পান না—এই অভিযোগ নিয়ে সৌমেন ঠাকুর মস্কো গিয়েছিলেন। নির্দেশ আসত মস্কো ও বৃটেনের কমউনিস্ট দল থেকে। গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা দেশের শত্রু—এই তত্ত্বে এসে পৌঁছানোর ফলে দলের নেতারা ১৯৩০ সালের আন্দোলনে যোগ দেননি। অথচ হিটলারের অভ্যুদয়ের (১৯৩৩) পর ভীত হয়ে মস্কো তাঁদের যুক্তফ্রন্ট গড়ার কথা বলায় তাঁরা কংগ্রেসে ঢুকেছেন। মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে তাঁরা আন্দোলন শুরু করেছিলেন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে, কিন্তু সেই বৃটেন ১৯৪১ সালে রাশিয়ার মিত্র হয়ে উঠেছে, তাঁরা ১৯৪২-এর আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন। ১৯৬২ সালে চীনের ভারত-আক্রমণের সময় তাঁদের ঝোঁকটা ছিল ওই সাম্রাজ্যবাদী দেশের দিকেই। এই দলটার মেরুদণ্ড আছে?

আর এক নেতাকে তিনি বলেছেন—তাঁর ভাষণ এত বাজে যে, সেটা শোনা যায় না।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে কি এমন থাকে? 'মাথা ভেঙে দেব,' 'হার হবেই' ইত্যাদি, তাই না? তাঁর ভাষণের মাঝখানে তাঁর দলের শ্রোতারাই উঠে গেছেন কেন বহু জায়গায়?

সব শেষে বলি— মুখ্যমন্ত্রী হলেন 'leader of this people of his state'—(কেডিয়া-পাণ্ডে— ইন্ডিয়ান কন্‌স্টিটিউশান, পৃঃ ১৮১)।

কিন্তু না। 'আমরা'-ওরা' বিভাজন দিয়ে তিনি কোটি কোটি রাজ্যবাসীকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি এখন একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর নেতা।

সব মিলিয়ে বলা যায়— বুদ্ধ বাবু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পুরোপুরি ব্যর্থ। কোনও দিক থেকেই তিনি তাঁর উচ্চপদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেননি। অনেক আগেই তিনি বিদায় নিলে ভাল হোত।

রাজ্য রাজনীতি

বিজয়ওয়াড়া প্লেনামে কোণঠাসা এরাজ্যের সি পি এম

নিশাকর সোম

৯ আগস্ট জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্নিক্ষরা দিন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ধ্বনি ছিল— করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। তার কোনও উল্লেখ ছাড়াই ৯ তারিখে লালগড়ে মমতা ব্যানার্জির সভা হলো। গান গাইলেন নচিকেতা— যিনি সুভাষ চক্রবর্তীর ভক্ত ছিলেন, এখন মমতার ভক্ত। তিনি গাইলেন কমিউনিস্টদের গান— "পথে এবার নামো সাথী", "উই শ্যাল ওভার কাম"— পল রবসনের গান। কোথায় গেল মুকুন্দ দাসের গান? বামপন্থী জুতো কেড়ে তাতে পা-গলিয়ে বিপ্লবী বামপন্থী!

লালগড়ে মমতার সভা—বস্তুত তৃণমূল এবং মাওবাদী তথা তাদের গণসংগঠন জনসাধারণ কমিটির যৌথ উদ্যোগের সভা। তাই সভায় সুবিশাল সমাবেশ হয়েছে। বুদ্ধ বাবুর অবিমৃষ্যকারিতায় এবং ৩৩ বছরের অবহেলায় আজ লালগড়-এ লালঝাণ্ডা উড়েনি। উড়েছিল তৃণমূল আর জনসাধারণ কমিটির পতাকা যুক্তভাবে। প্রভাতী কোনও এক পত্রিকায় ছবি বেরিয়েছে— জনসাধারণের কমিটি ফেস্টুন, ধামসা-মাদল নিয়ে বিরাট মিছিল করে আসছে। সেই সভায় গ্রেপ্তারী পরোয়ানাতে জর্জরিত মাওবাদী নেতা অসিত মাহাতো এবং মনোজ মাহাতো ছিলেন। আবার সুযোগ বুঝে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। আরও বেশ কয়েকজন 'ওয়ান্টেড' নেতা-কর্মীদের ঘোরাফেরা করতেও দেখা গেল। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে হাঙ্গামা সৃষ্টির পথে না-গিয়ে বুদ্ধি মানের কাজ, থুড়ি, পুলিশের একাংশ তো এদেরই পক্ষে! সভায় মাওবাদী নেতার 'হত্যা'-র জন্য নিন্দা করা হয়। এনকাউন্টারকে মিথ্যা বলা হয়। শহীদের মর্যাদা পেলেন আজাদ। যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই 'হত্যা'-র জন্য দায়ী। মাওবাদীদের বিরুদ্ধে আর এটাই কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। মমতাদেবী কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথবাহিনীকে সরিয়ে নেওয়ার দাবি তুললেন। তিনি হিংসা ছেড়ে উন্নয়নের পথে আসার জন্য অস্ত্র ছেড়ে "মামকেং শরণম্ ব্রজ" বললেন। এইসব আজ সম্ভব হলো সিপিএমের গুণ্ডাবাজির ফলে এবং অহঙ্কার ও দম্ভের ফলে। গরীব মেরে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের সেবাদাস হয়েছে সিপিএম পার্টি আর তার নেতারা। তার ফল ফলেছে।

সভার নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজ্য পুলিশের হাতে থাকার কথা। কিন্তু সভায় ২৫০ জন রেল নিরাপত্তা বাহিনী নিজেদের সিদ্ধান্ত মতো 'ডিউটি' করেছেন। সভায় গামছা বিক্রি বা গামছা মাথায় চাপা দেওয়া দেখা গেছে। এই গামছা মুখে চাপা দিয়ে মাওনেতা কিষেণজি-কে ছবিতে দেখা যেত। কিষেণজির নামের এই গামছা প্রতিটি ৭০ টাকা দামে ১৫০টি এক নিমেষে বিক্রি হয়েছে।

মমতার লালগড়ের সভার জন্য ২,৫০০ পুলিশ কর্মী, ১২০ জন কোবরা কম্যান্ডো, মাইন ডিটেকটরস এবং অ্যান্টিল্যান্ডমাইন গাড়ি নিয়োজিত হয়েছিল। খরচ হলো ১.৫ কোটি টাকা। মমতার কনভয়ে প্রথমদিকের একটি গাড়িতে মমতা-র ডামি ছিল। তৃতীয় গাড়িতে আসল মমতা ছিলেন। সব মিলিয়ে মমতা ব্যানার্জির লালগড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সফল হয়েছে।

লালগড়ের সমাবেশ উপলক্ষে বিক্রম নামের জনৈক মাওনেতা বলেছেন, এটা মমতার নিজস্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। বিশেষ করে আগামী বিধানসভায় নির্বাচনকে উপলক্ষ করে। মাওবাদীদের এই অংশের কথায়, মমতা বহু প্রতিশ্রুতি দেন— এটাও সেইরকম।

> **"শালকিয়াতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল— "হিন্দী বলয়ে শক্তি বাড়িয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত হওয়া।" আজ ত্রিশ বছর বাদে বলা যায়, সেই লক্ষ্য তো পূরণ হলোই না, উপরন্তু কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম তলিয়ে গেলো।"**

সে যাই হোক না কেন, মাওবাদীদের উত্থান দরিদ্র জনজাতিদের ক্রমাগত বঞ্চনার ফলে। আজ মাওবাদীরা জমি পেয়ে গেছে। এখন তারা সমগ্র রাজ্যে শিকড় ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবে। আর তারা তৃণমূলকে বিশেষ করে নির্বাচনী কাজে অংশগ্রহণ করে নিজেরা জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যাবে।

লালগড়ের সমাবেশের বিরুদ্ধে বাম-ছাত্র-যুব সংগঠনের এক যৌথ বিক্ষোভ কর্মসূচী নিয়েছিল। সেই মিছিলে আর এস পি-এর ছাত্র-যুব সংগঠন যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল। তাদের বক্তব্য হলো— "লালগড়ে সভা করার অনুমতি দিয়েছে রাজ্য-সরকার। কাজেই তার বিরোধিতা করার অর্থ রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করা। তারা রাজ্য সরকারের অন্য বিষয়ের বিরুদ্ধে মিছিল করতে রাজি আছে।"

লালগড়ে মমতার 'অরাজনৈতিক' মঞ্চের সভা সম্পর্কে বেশ কিছু বক্তব্য প্রকাশ করেছেন লালগড়ের মানুষজন তথা মাওবাদী-সমর্থকরা। ধরমপুর অঞ্চলের দশরথ টুডুর বক্তব্য— "তৃণমূল নেত্রী নির্বাচনী প্রচার করলেন। লালগড় তথা যাঁরা মাঠ ভরিয়ে দিল তাঁদের মঞ্চের কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হলো না। তাঁদের মর্যাদা দেওয়া হলো না।"

এক ঝুমুর শিল্পী বললেন, "আমরা অচ্ছ্যুৎ। শহরের বাবু গান গাইলেন।" ঝাড়খন্ড পার্টির নেত্রী চুনিবালা হাঁসদা বলেন, "জঙ্গলমহলের মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা হলো।" দলছুট মাওবাদী নেতা গুরুচরণ বাস্কে বলেন, "নেত্রী নিজের প্রভাব বিস্তার করার জন্য এই সভা করলেন। সিপিএম-এর মতো মমতা, স্বামী অগ্নিবেশ, মেধা ও কিষেণজি লালগড়কে নিজেদের দখলে রাখতে চাইছেন। এঁরা কেউই লালগড়ের মানুষের কথা ভাবেন না।"

এবার দেখা যাক, বিজয়ওয়াড়া-তে সিপিএম-এর প্লেনামে কি হলো। উল্লেখ করা প্রয়োজন, বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরে পরেই হাওড়ার শালকিয়াতে প্লেনাম হয়। সেখান থেকে সুন্দরাইয়ার নীতি এবং নেতৃত্বকে বিদায় দেওয়া হয়।

শালকিয়াতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল— "হিন্দী বলয়ে শক্তি বাড়িয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত হওয়া।" আজ ত্রিশ বছর বাদে বলা যায়, সেই লক্ষ্য তো পূরণ হলোই না, উপরন্তু কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম তলিয়ে গেলো।

বিজয়ওয়াড়াতে যা হলো সেটা সংক্ষেপে বলা যায়— (১) রাজনৈতিক আলোচনা করে ক্ষোভ উগরানোর সুযোগ করে দিয়ে পলিটিক্যাল সেফটি ভাল্‌ব-এর কাজ করা হলো। (২) প্রকাশ কারাত তাঁর অনুকূলে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠকে জড়ো করতে সফল হলেন। (৩) পশ্চিমবঙ্গের পার্টি নেতৃত্ব তথা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সবাই সরবে সমালোচনা করলেন। এমনকী পশ্চিমবঙ্গের রেজ্জাক মোল্লা বা শ্রীদীপ ভট্টাচার্য কেউই বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-বিনয় কোঙারের পক্ষে একটা শব্দও খরচ করেনি। যদিও কারাত তথা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তারা সমালোচনা করে। বলা হয় "ইউপিএ সরকার থেকে সমর্থন তোলাবার সময়টার নির্বাচন ঠিক হয়নি।" এর উত্তরে আর একটি সত্য উদঘাটিত হলো— বহুপূর্বেই এই সমর্থন তোলার কথা পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে উঠেছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নেতারা পঞ্চায়েত নির্বাচনের দোহাই পেড়ে সেটাকে ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন। আরও জানা গেল, পার্টির সিদ্ধান্ত ইউপিএ-এর নেতৃত্বের কাছে কে বা কারা পৌঁছে দেন, কেরল, ত্রিপুরা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র-এর নেতারা পশ্চিমবঙ্গের নীতি ও নেতাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য এর সারমর্ম হলো— পশ্চিমবঙ্গের পার্টি কেন্দ্রীয় নীতিকে অগ্রাহ্য করে নিজস্ব নীতিতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের পার্টি 'কংগ্রেসের লেজুড়' হয়ে কংগ্রেসকে অবলম্বন করে চলতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গের পার্টি তথা মন্ত্রিসভা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কৃষকসভা শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কৃষকদের ভিত্তি করেই পশ্চিমবঙ্গ পার্টি দাঁড়িয়ে ছিল। সেই কৃষকদের বিরোধী করে দেবার নীতি গ্রহণ করেছিল। এর ফলেই নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর হলো। মহারাষ্ট্র এবং ত্রিপুরার নেতারা বলেন— "পশ্চিমবঙ্গের পার্টির একাংশ কেন সোমনাথ চ্যাটার্জিকে সমর্থন করছেন? এটা পার্টিনীতির বিরোধী।"

সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো— প্লেনাম-এ এক সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করা। কেরল ও পশ্চিমবঙ্গকে 'যেমন খুশী খাও' এই নীতি গ্রহণের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

অন্য রকম

পরিবেশ-বান্ধব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পরিবেশ রক্ষায় অভিনব উদ্যোগ। ভারতবর্ষে ধর্মের যে চিরন্তন, শাশ্বত বাণী বিধৃত রয়েছে তাকেই নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকজন শিল্পী। গণেশ ঠাকুরের জন্মদিন প্রতি বছরই শীতের প্রাক-মুহূর্তে ধূম-ধাম করে পালিত হয় সেখানে। সেইসঙ্গে পরিবেশ দূষণেরও অন্যতম সহায়ক। শীতের মুখেও তাই শিল্পীদের কপালে ঘাম ফুটে উঠত শুধু নয়, এলাকার বাসিন্দারাও একটা গরম আবহাওয়া অনুভব করতেন।

আসলে বিভিন্ন কারণে ও সরকারি গাফিলতিতে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর মারাত্মক কু-প্রভাব অন্ধ্রপ্রদেশের ওপর বহু বছর ধরেই পড়ছিল। তার ওপর প্লাস্টার অব্ প্যারিস

মাচিলিপটনমের মাটি দিয়ে তৈরি ১২ ফুট উঁচু গণেশ মূর্তি।

প্লাস্টার অফ প্যারিস দ্বারা এতদিন সেখানে তৈরি হোত গণেশ মূর্তি। তাতে পড়তো কেমিক্যাল দিয়ে বানানো চড়া রঙের প্রলেপ। বলা বাহুল্য, এই প্লাস্টার অব প্যারিস এবং কেমিক্যাল মিশ্রিত রঙ—দু'টো বস্তুই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক তো বটেই, ও চড়া রঙের ব্যবহার সেই বিশ্ব উষ্ণায়নকে আরেকটু উষ্ণ করে তুলেছিল।

সরকার উদাসীন থাকলেও আশু বিপদ উপলব্ধি করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসেন শিল্পীরা। প্লাস্টার অব্ প্যারিস ছেড়ে তাঁরা মাটির গণেশ মূর্তি গড়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের এই 'পরিবেশ-বান্ধব' মূলক সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সমর্থন করলেও অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার কিন্তু একটি সরকারি আদেশে প্লাস্টার অব্ প্যারিস ব্যবহারের কথা বলেছে। সরকারের বিরুদ্ধে এই অসম লড়াই-এ কিন্তু একেবারেই দমে যাননি সেখানকার শিল্পীরা। গত বছর তাঁরা মাটির গণেশ মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। এবারও তাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই কর্মটি করে জলদূষণের হাত থেকেও রাজ্যকে রক্ষা করছেন তাঁরা। কারণ প্যারিসের মূর্তির গায়ে যে রঙ করা হয়, তাতে থাকে ক্যাডমিয়াম, পারদ, আর্সেনিক, সীসা, ক্রোমিয়াম, নিকেলের মতো মারাত্মক ক্ষতিকারক ও জল দূষণকারী রাসায়নিক। মাটির মূর্তি গড়ে এটুকু অন্তত বন্ধ করতে পেরেছেন তাঁরা।

তবে সরকারকে পাশে না পেলেও অন্ধ্রপ্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ন্যাশানাল গ্রীণ কর্পস (এ পি এন জি সি)-কে পাশে পেয়ে গিয়েছেন তাঁরা। আর্থিক দিক দিয়েও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না তাঁরা। হায়দরাবাদে ট্রি-গার্ড ফাউন্ডেশন জনাকুড়ি শিল্পীকে ৫০,০০০ প্রতিমা তৈরির বরাত দিয়েছিল গতবারই। অন্ধ্রের প্রতিমা তৈরির কারিগররা এখন মৃৎশিল্পী। তাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো গত বছরে বন্দর শহর মাচিলিপটনমে সেখানকার মাটি নিয়ে একটি বিশালাকৃতি প্রায় ১২ ফুট উঁচু গণেশমূর্তি নির্মাণ করা।

রাজ্যে রাজ্যে চলছে সংরক্ষণের প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সারা দেশজুড়ে সরকারি চাকরি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার জন্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে সংরক্ষণ দেওয়ার একরকম প্রতিযোগিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতায় নেমেছে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং প্রদেশের নির্বাচিত সরকার। আর সামনে নির্বাচন থাকলে তো কথাই নেই। সংবাদমাধ্যমের দৌলতে যতটা প্রকাশ্যে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে আপাতত চ্যাম্পিয়ন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিচ্ছে করুণানিধির খাসতালুক তামিলনাড়ু।

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক আদেশে সুপ্রীম কোর্ট তামিলনাড়ু সরকারকে আরও একবছরের জন্য শিক্ষা এবং চাকুরি ক্ষেত্রে তপশীলি জাতি, জনজাতি, পিছিয়ে পড়া, ব্যাপক পিছিয়ে পড়া (Major Backward Class)-দের জন্য সর্বমোট সংরক্ষণ ৬৯ শতাংশ সংরক্ষণ চালিয়ে যেতে বলেছেন। এর আগে হাইকোর্টের প্রদত্ত রায়ে- "সর্বমোট সংরক্ষণ কখনওই ৫০ শতাংশের বেশি হবে না" বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখন সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ে তা বাতিল হয়ে গেল। তামিলনাড়ুর উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে ঝাড়খণ্ডের দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রদত্ত হাইকোর্টের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার জন্য তৎপর হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষণ-সংস্থায় ২০০৮ থেকে এনিয়ে তিন বছর ওবিসি-দের জন্য ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষণ বহাল আছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজ্যে সংরক্ষণ নীতি কেমনভাবে চলছে, সেদিকে নজর বুলিয়ে নেওয়া দরকার।

তামিলনাড়ু ঃ

তামিলনাড়ুকেই প্রথমে ধরা যাক। কেননা কোটা অর্থাৎ সংরক্ষণ ব্যবস্থাটা এখান থেকেই শুরু। সুপ্রীম কোর্ট সম্প্রতি ৬৯ শতাংশ সংরক্ষণ আরও একবছর বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রায় দেড়শ বছর আগে সাবেক ইংরেজ আমলের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে 'সংরক্ষণ' চালু হয়েছিল, সেটা ১৮৫৪ সাল। তখনকার ইংরেজ সরকার কালেক্টরদেরকে নির্দেশ (অর্ডার নং-১২৮/২) দিয়েছিল বিভিন্ন প্রমুখ জাতির জন্য চাকরিতে সংরক্ষণ দিতে। কয়েক দশক বাদে ১৯২১ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে জাস্টিস পার্টি ক্ষমতায় ছিল। সরকারিভাবেই তখন আরও একটি নির্দেশ জারি করে প্রমুখ জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মীয় ভিত্তিতে সংরক্ষণের জন্য কোটা স্থির হয়। ওই নির্দেশ অনুসারে অব্রাহ্মণ হিন্দুদের জন্য চাকরিতে ৪৪ শতাংশ কোটা নির্দ্ধারণ করা হয়। ব্রাহ্মণ, মুসলমান, খৃস্টান এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের জন্য ১৬ শতাংশ এবং তপশীলি জাতিদের জন্য ৮ শতাংশ কোটা ধার্য করা হয়। অবশ্য ছ'বছর পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর হয়নি। ইতিমধ্যে তৎকালীন মন্ত্রী মুখাইয়া মুদালিয়ার অন্য এক নির্দেশ জারি করেন ১৯২৭ সালে। তাতেও চাকরিতে সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই নতুন আদেশটিকে 'সাম্প্রদায়িক সরকারি নির্দেশ' বলে অভিহিত করা হয়।

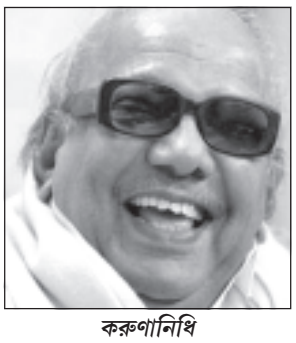

করুণানিধি

১৯৫০ পর্যন্ত ওই আইন বলবৎ ছিল। চাকরিক্ষেত্রে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এজন্য সংরক্ষণ বহাল তবিয়তে চলেছিল। মাদ্রাজ হাইকোর্টে দুটি মামলা দায়ের হয়। সংবিধান ভঙ্গের ব্যাপারটা জোরালো হয়ে ওঠে। মামলাকারীরা ছিলেন— শানবাগম্ দুরাইস্বামী এবং সি আর শ্রীনিবাসন। তাঁদের বক্তব্য ছিল—কোটা (সংরক্ষণ) ব্যবস্থার জন্য তাঁরা মেডিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তির সুযোগ পাননি। আদালত এই ঘটনাকে 'বৈষম্যের শিকার' এবং সংবিধান উল্লঙ্ঘন হয়েছে স্বীকার করে রায় দেন। কেননা সংবিধান অনুসারে কোনও নাগরিককে ধর্ম, জাত-পাত এবং ওই জাতীয় কারণে বৈষম্য করা হবে না— এটা সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট বা প্রদত্ত। এই মামলা শিগগিরই সুপ্রীম কোর্টে গেল। সর্বোচ্চ আদালত ও হাইকোর্টের রায়কে বহাল রাখেন। এর ফলে তামিলনাড়ুতে ব্যাপক হৈ-চৈ এবং প্রতিবাদ হয়। পরবর্তী কয়েক দশক পর্যন্ত যা রাজ্য রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয় বা দিক্-পরিবর্তন করে।

'পেরিয়ার'—ই ভি রামস্বামীর দ্রাবিড় কাজাগাম, যা জাস্টিস পার্টির উত্তরাধিকারী এবং ডি এম কে-র পূর্বসূরী, তারাই ওই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে ইস্যু খাড়া করে। অগ্রবর্তী হয়ে ব্যাপক সমর্থন এবং গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। আন্দোলনের আগুনকে আয়ত্তে আনার জন্য জওহরলাল নেহরুর প্রধানমন্ত্রীত্বে সংবিধান সংশোধনের সিদ্ধান্ত হয়। সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর ওটাই ছিল প্রথম সংশোধন। এভাবে ১৮ জুন ১৯৫১-তে (Amendment Act, ১৯৫১গ্ন প্রথমবার সংশোধন হয়। ওই সংশোধনীতে সংবিধানের ১৫নং ধারায় রাজ্য সরকারগুলোকে সামাজিক ও শৈক্ষিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া এবং তপশীলি জাতি-জনজাতিদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

রাজ্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা আবার ফিরে আসে। ১৯৫৭ সালে প্রথমবার রাজ্য পুনর্গঠন হওয়ার পর একটি নতুন ফর্মুলা আমদানি করা হয়। পশ্চাৎপদশ্রেণীর জন্য ২৫ শতাংশ এবং তপশীলিদের জন্য ১৬ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত হয়। তারপর রাজ্যে ডি এম কে ক্ষমতায় আসার পর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের (বি সি) জন্য সংরক্ষণ বাড়িয়ে ৩১ শতাংশ করা হয়।

এরপর ১৯৭৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী হন এম জি রামচন্দ্রণ। তিনি সংরক্ষণ প্রাপকদের জন্য বার্ষিক আয়ের সীমা ৯০০০ টাকা বেঁধে দেন। এরপর নির্বাচনের মুখে ব্যাকওয়ার্ডদের জন্য সংরক্ষণের কোটা বাড়িয়ে পঞ্চাশ শতাংশ করা হয়। ওই ডি এম কে সরকারই পরে তপশীলি উপজাতিদের জন্য নির্ধারিত কোটায় আরও এক শতাংশ বাড়িয়ে দেয়। এভাবেই সংরক্ষণের সীমা বাড়তে বাড়তে গিয়ে মোট ৬৯ শতাংশে পৌঁছায়। ব্যাকওয়ার্ডদের জন্য নির্ধারিত ৫০ শতাংশকে দু'ভাগ করা হয়— ৩০ শতাংশ ব্যাকওয়ার্ডদের জন্য এবং বাকি কুড়ি শতাংশ মেজর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস এবং অনথিভুক্ত উপজাতিদের জন্য নির্দিষ্ট হয়। বর্তমানে রাজ্য সরকার ব্যাকওয়ার্ডদের ৩০ শতাংশ থেকেই মুসলমানদের জন্য এবং 'অরুণথাথিয়ার' জাতিগোষ্ঠীর জন্য পৃথক সংরক্ষণ নির্দিষ্ট করেছেন তপশীলি জাতির জন্য নির্ধারিত ১৮ শতাংশ থেকে কেটে নিয়ে।

ছত্তিশগড় ঃ

সারাদেশ জুড়েই প্রায় সব দলেরই রাজনৈতিক নেতারা এক সুরে জনজাতিদের জন্য সরকারি চাকরি এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সংস্থায় আসন সংরক্ষণ-এর হার বৃদ্ধি করে ৩২ শতাংশ করতে চাইছেন। ছত্তিশগড়ের

রমণ সিং

রমণ সিং সরকার সর্বমোট সংরক্ষণের পরিমাণ ৫০ শতাংশের উপরে নিয়ে যেতে ক্যাবিনেট সাব কমিটির বৈঠক ডাকতে চলেছেন বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে বরিষ্ঠ মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত সাব কমিটি রাজ্যে তপশীলি জাতি ও জনজাতি সংখ্যার সমানুপাতে সংরক্ষণ-এর জন্য সুপারিশ করেছেন। অপরপক্ষে রাজ্যের তপশীলি জাতিদের বিভিন্ন সংস্থা এর বিরোধিতা করেছেন— ওই সুপারিশ কার্যকর হলে তাদের কোটা কমে যাবে এবং ও বি সি-দের জন্য সংরক্ষণ বেড়ে ২৭ শতাংশে পৌঁছাবে।

বর্তমানে রাজ্যে তপশীলি উপজাতিরা প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে ১৮ শতাংশ, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর চাকরিতে কুড়ি শতাংশ সংরক্ষণ পেয়ে থাকেন। তপশীলি জাতিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১৫ শতাংশ এবং কুড়ি শতাংশ। আর ও বি সি-দের জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ-এর পরিমাণ ১৪ শতাংশ।

যারা জনজাতিদের জন্য সংরক্ষণের কোটা বাড়িয়ে ৩২ শতাংশ করতে চাইছেন তারা কেন্দ্রের উদাহরণ দিচ্ছেন। কেন্দ্র ২০০৫ সালের জুলাই মাসেই এস সি, এস টি এবং ও বি সি-দের জন্য কেন্দ্র সরকারের চাকরিতে সরাসরি নিযুক্তির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ এর পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। যার ফলে ছত্তিশগড়ে এস টি-রা ৩২ শতাংশ সংরক্ষণ, এস সি-দের ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ এবং ও বি সি-রা ৬ শতাংশ সংরক্ষণের সুবিধা পাচ্ছেন। ক্যাবিনেটের সাব-কমিটিতে বিষয়টি উঠে আসার দরুণ, কমিটির কিছু মন্ত্রী উচ্চবর্ণের গরীবদের জন্যও ৫ শতাংশ সংরক্ষণের দাবী তুলছেন। অন্যরা ও বি সি-দের কোটা বাড়িয়ে ২৭ শতাংশ করার পক্ষপাতী। যদি এইসকল সুপারিশ কার্যকর হয় তাহলে সরকারি চাকরি এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কোটা বা সংরক্ষণের মোট অনুপাত ৭২ শতাংশে পৌঁছে যাবে।

মধ্যপ্রদেশ ঃ

২০০৩-এ মধ্যপ্রদেশ সরকার ও বি সি-দের জন্য সংরক্ষণ বাড়িয়ে ২৭ শতাংশ করে। কিন্তু একজন সাধারণ শ্রেণীর নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দেন। যা এখনও বলবৎ। চালু সংরক্ষণের পরিমাণ হলো— শিক্ষা এবং চাকুরিক্ষেত্রে তপশীলি জাতির জন্য ১৬ শতাংশ, উপজাতিদের জন্য কুড়ি শতাংশ এবং ও বি সি-দের জন্য ১৪ শতাংশ। জেলাস্তরে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের জনসংখ্যার সমানুপাতে সংরক্ষিত হবে। উদাহরণ হিসেবে ঝাবুয়া জেলায় জনজাতিদের অনুপাত মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ। মাণ্ডলা জেলায় তপশীলি উপজাতিদের কোটা ৬২ শতাংশ এবং তপশীলি জাতিদের

শিবরাজ সিং চৌহান

কোটা ৬ শতাংশ।

হরিয়ানা ঃ

এই রাজ্যে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের (পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী) জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ লাগু করা হয়নি। বর্তমানে সরকারি চাকরিতে তপশীলি জাতির জন্য কুড়ি শতাংশ, অনুন্নতদের জন্য ২৭ শতাংশ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য তিন শতাংশ সংরক্ষণ চালু রয়েছে। তবে প্রথম শ্রেণীর চাকরিতে মাত্র দশ শতাংশ পদ তপশীলি জাতির জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। একইভাবে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের জন্য এই শ্রেণীতে সাত শতাংশ পদ সংরক্ষিত আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি কলেজে ৫১ শতাংশ আসন সংরক্ষিত, তপশীলি জাতি ২০ শতাংশ আর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ২৭ শতাংশ। প্রাক্তন চাকুরীজীবীদের উপর নির্ভরশীলদের ক্ষেত্রে ১ শতাংশ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য তিন শতাংশ আসন সংরক্ষিত।

পাঞ্জাব ঃ

বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য সরকারিতে ৫০ শতাংশ পদ সংরক্ষিত রয়েছে। তপশীলি জাতির জন্য ২৫ শতাংশ, অনুন্নত (বি সি) এবং ও বি সি-দের জন্য ১৩ শতাংশ, প্রাক্তন চাকু রীজীবীদের জন্য ১৩ শতাংশ, প্রতিবন্ধীদের জন্য তিন শতাংশ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের জন্য এক শতাংশ পদ সংরক্ষিত আছে। উপরের সব যোগ করলে ৫০ শতাংশ পার হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে

প্রকাশ সিং বাদল

কখনওই তা ৫০ শতাংশের বেড়া টপকাতে পারে না।

উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে ৫১ শতাংশ আসন সংরক্ষিত। তপশীলি জাতি ২৫ শতাংশ, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ৫ শতাংশ, অনুন্নত এবং সীমান্ত এলাকার ছাত্রদের দুই শতাংশ করে, খেলোয়াড়, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের ছাত্রদের, প্রতিরক্ষা কর্মীদের সন্তান-সন্ততি এবং সন্ত্রাসের শিকার ও বিধবাদের জন্য দুই শতাংশ হিসেবে আসন সংরক্ষিত করা আছে।

কেরল ঃ

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ থেকেই কেরলে সংরক্ষণ চালু যা এখনও একটি চালু বিষয়। উচ্চবর্ণের হিন্দু নায়ার সম্প্রদায়ের লোকেরা একসময় ভূমি সংস্কার আইনের বহ্ন্যুৎসব পালন করেছিল। তারা এখনও সরকারি চাকরি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক দিক থেকে উচ্চবর্ণের দুর্বলশ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের দাবীতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি সরকার মনোনীত একটি সমিতি খুঁজে পেয়েছেন যে, "এজাভা সম্প্রদায়ের হিন্দুরাও ও বি সি, তারা বিগত ছয় দশক ধরে সরকারি ক্ষেত্রে ভালোরকম প্রতিনিধিত্ব করছে। কিন্তু মুসলমানরা আনুপাতিক হারে অনেক পিছিয়ে পড়েছে।" এদিকে উন্নত ও অনুন্নত হিন্দু কে— তার সংজ্ঞা নিয়ে পরস্পর বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। ফলে উভয়বর্গের উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। মুসলমান, এজাভা এবং থিয়া হিন্দুরা অনুন্নত শ্রেণী থেকে খৃস্টমতে মতান্তরিত হয়েছে। সরকারি চাকরিতে বর্তমানে চালু সংরক্ষণ প্রক্রিয়া এরকম—

ভি এস অচ্যুতানন্দন

ও বি সি (হিন্দু)-দের জন্য ১৪ শতাংশ, মুসলমানদের জন্য ১২ শতাংশ, ল্যাটিন ক্যাথলিক (খৃস্টান)-দের জন্য চার শতাংশ, তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য দশ শতাংশ, 'নাদার' সম্প্রদায়ের জন্য দুই শতাংশ, ধীবরদের জন্য এক শতাংশ,

(এরপর ৭ পাতায়)

মালদার অরক্ষিত সীমান্তে ঢুকছে জঙ্গীরা গোয়েন্দাদের সতর্কতা

সংবাদদাতা ঃ মালদা ॥ মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার উন্মুক্ত সীমান্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। মালদা জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল কালিয়াচক এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি থানায় জঙ্গি হানার আশঙ্কায় পুলিশকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। গত মাসে দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি থানার হাঁড়িপুকুর সীমান্তে ডিটোনেটার সহ সেখ ইলিয়াস নামে এক যুবককে বি. এস. এফ আটক করায় সেই উদ্বেগ আরও বেড়েছে। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে হিলি সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন বিস্ফোরক মজুত করেছে। স্বাধীনতা দিবসের আগে বা পরে সেগুলি এদেশে ঢোকানোর চেষ্টা হবে। এবং পরে সেই অস্ত্রশস্ত্র কাশ্মীরে পাঠাতে জঙ্গিরা ছক কষেছে বলে খবর। ডিটোনেটার উদ্ধার হওয়ার পর নজরদারি বাড়িয়েছে বি এস এফ। গোয়েন্দাদের বক্তব্য, সীমান্তের জিরো পয়েন্টে হাঁড়িপুকুর গ্রামকে জঙ্গিরা নিরাপদ ঘাঁটি করে গ্রামের বাসিন্দাদের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে। দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে ৪৫ কিলোমিটার জুড়ে কাঁটা তারের বেড়া নেই। মালদা জেলার নদীর কিছু অংশ এখনও উন্মুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গে ৪৩টি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সংরক্ষণের নামে তোষণ

(৬ পাতার পর)

'বিশ্বকর্মা'দের জন্য তিন শতাংশ এবং ব্যাকওয়ার্ড খৃস্টানদের জন্য এক শতাংশ।

ইঞ্জিনিয়ারিং এবং চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাৎপদদের জন্য ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত। এছাড়া মুসলমানদের জন্য ৮ শতাংশ, ও বি সি (হিন্দু)-দের জন্য ৯ শতাংশ, অন্যান্য পশ্চাৎপদ হিন্দুদের জন্য ৫ শতাংশ, অন্যান্য পশ্চাদপদ খৃস্টানদের জন্য এক শতাংশ, তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষিত করা আছে। উচ্চবর্ণের দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের কেরল সরকার ২০০৮ সালেই সরকারি পরিচালনাধীন কলেজগুলোতে দশ শতাংশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭.৫ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করেছে।

বিহার ঃ

সরকারি চাকরি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিহার সরকার সাধারণভাবে ও বি সি-দের জন্য ২৭ শতাংশ এবং এস সি/এস টি-দের জন্য ১৮ শতাংশ সংরক্ষণ করেছে। বিরোধী দলগুলো মুসলমানদের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণের কোটা দাবী করেছে। এবং অবশ্যই সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার অজুহাতে। মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার এ ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত হলেও

নীতিশ কুমার

বাস্তবে তা করতে পারেননি। উল্লেখ্য, রাজ্যের জনসংখ্যার ৭.৪৪ শতাংশ পাসমন্দা বা ও বি সি মুসলমানরা ও বি সি কোটাতেই সংরক্ষণের সুবিধা পাচ্ছেন।

১৯৭৮ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর সরকারি চাকরিতে ২৬ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করেন। তারমধ্যে ১২ শতাংশ অত্যধিক পিছিয়ে পড়াদের জন্য, ৮ শতাংশ ওবিসি-দের জন্য, ৬ শতাংশ মহিলা এবং অন্যান্যদের জন্য নির্দিষ্ট হয়। এই বিভাজন 'কর্পূরী ফর্মুলা' বলে অভিহিত। উচ্চবর্ণের পক্ষ থেকে বিরোধিতার মধ্যেই কর্পূরী ফর্মুলা কার্যকর হয়।

১৯৯২ সালে জাতপাতের রাজনীতি করে সামনে উঠে আসা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব আক্ষরিক অর্থেই মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করেন। সেখানে ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ নির্দিষ্ট হয় ও বি সি এবং ই বি সি (অত্যধিক অনুন্নত)-দের জন্য এবং ১৮ শতাংশ তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য।

মহারাষ্ট্র ঃ

সরকারি চাকরি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ সর্বমোট ৫২ শতাংশ। ভাগাভাগির হিসাবটা এরকম—

তপশীলি জাতি ১৩ শতাংশ, তপশীলি উপজাতি ৭ শতাংশ, যাযাবর এবং অনির্দিষ্ট জনজাতিদের জন্য ১১ শতাংশ, ও বি সি ১৯ শতাংশ, ২ শতাংশ বিশেষভাবে পশ্চাৎপদ শ্রেণীর জন্য। বিভিন্ন মারাঠী সংস্থা ও বি সি-দের জন্য ২৫ শতাংশ সংরক্ষণ দাবী করেছে। ছগন ভুজবলের মতো ও বি সি নেতারা আবার মারাঠীদের ওই দাবীর বিরোধিতা করেননি। আবার প্রচলিত ও বি সি কোটায় সংরক্ষণের ছাঁটাইও চান না।

হিমাচল প্রদেশ ঃ

এই প্রদেশে সরকারি চাকরি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তপশীলি জাতির জন্য ১৫ শতাংশ, তপশীলি উপজাতিদের জন্য ৭.৫ শতাংশ এবং ও বি সি-দের জন্য ১৮ শতাংশ পদ ও আসন সংরক্ষিত। এছাড়া প্রাক্তন চাকুরীজীবীদের জন্য ১৫ শতাংশ চাকরি সংরক্ষিত, তিন শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য, আরও তিন শতাংশ, ক্রীড়াবিদদের জন্য নির্দিষ্ট আছে। গত বছরই বি পি এল

প্রেমকুমার ধুমল

তালিকাভুক্ত পরিবারের সদস্যদের জন্য আলাদাভাবে আরও ১৫ শতাংশ সংরক্ষণ করা হয়েছে।

রাজস্থান ঃ

সংরক্ষণের দাবীতে ২০০৭ ও ২০০৮ সালে ব্যাপক হিংসাত্মক আন্দোলন হয়। যার ফলে ৭০ জন মানুষ মারা যান। রাজস্থানের গুর্জর সম্প্রদায় তাদেরকে তপশীলি উপজাতি বলে স্বীকৃতি দেবার দাবী তোলেন। তাছাড়া গুর্জররা এই আন্দোলন করে আসছিল। তিন বছর বাদে নতুন করে আন্দোলন দানা বাঁধে। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল কিরোরি সিং ভৈঁসলা ওই হিংস্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তারা রেল, সড়কসহ সবরকম যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিয়ে জনজীবন প্রায় স্তব্ধ এবং অচল করেছেন। প্রায় দু'মাস আন্দোলন চলে। রাজ্যের তৎকালীন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সরকারের সঙ্গে দফায়

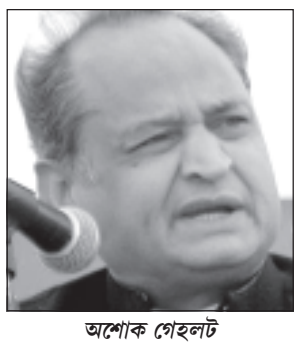

অশোক গেহলট

দফায় আলোচনা হয়। গুর্জর, রেবারি, বানজারা এবং গাড়িয়া লোহারদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা হলেই আন্দোলন থামে। এক বছর বাদে মে, ২০০৮-এ ভৈঁসলার নেতৃত্বে আবার আন্দোলন শুরু হয়। দাবী, গুর্জরদের তপশীলি উপজাতির তকমা দিতেই হবে। আরও একমাস রক্তাক্ত বিক্ষোভ চলার পর বসুন্ধরা সরকার একটি বিল পাশ করে গুর্জরদের পাঁচ শতাংশ এবং উচ্চবর্ণের আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়াদের জন্য ১৬ শতাংশ সংরক্ষণ মঞ্জুর করে।

যাই হোক, এতসবের পরেও ২০০৯ সালে আবার তৃতীয় দফায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হওয়ার পরে রাজস্থানের রাজ্যপাল এস কে সিং বিলে সম্মতি দেন। কিন্তু রাজস্থান হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দেন। কেননা, সুপ্রীম কোর্টের গাইডলাইন 'সর্বমোট সংরক্ষণ ৫০ শতাংশের বেশি হবে না'— যা অমান্য করা হয়েছিল। ২০১০-এ গিয়ে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং গুর্জর আন্দোলনের শীর্ষ নেতা কিরোরি সিং ভৈঁসলার সঙ্গে এক বৈঠকে ফয়শালা হওয়ার পর গুর্জর-আন্দোলন আপাতত সমাপ্ত। সরকার ধাপে ধাপে গুর্জর এবং অন্য তিনটি সম্প্রদায়ের জন্য পাঁচ শতাংশ করে সংরক্ষণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর ফলে আদালতের 'স্টে-অর্ডার' এড়ানো যাবে।

ঝাড়খণ্ড ঃ

সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও (সর্বাধিক ৫০ শতাংশ) শিক্ষা এবং চাররিতে সর্বমোট ৮৮ শতাংশ সংরক্ষণের পক্ষপাতী। এটাকে 'রাজ্য সরকারের নীতি' বলে চালানোর প্রয়াস হয়েছিল। ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের ভাগাভাগিটা ছিল এরকম— তপশীলি জাতি ১০ শতাংশ, তপশীলি উপজাতি ২৬ শতাংশ, ও বি সি ১৪ শতাংশ। ২০০২ সালে এইরকমভাবে নোটিফিকেশন হয়েছিল। এর আগে বাবুলাল মারাণ্ডির মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে রাজ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে এস সি/এস টি/ও বি সি-দের জন্য সংরক্ষণ দেওয়ার কথা উঠেছিল। সেই হিসেবে যথাক্রমে মোট জনসংখ্যার ১০, ২৬ ও ৫২ শতাংশ হয়। এটাও ২০০১-এর জনসংখ্যার অনুপাত। সেজন্য মারাণ্ডি সরকার ৮৮ শতাংশ সংরক্ষণের কথা তুলতেই সর্বত্র প্রবল প্রতিবাদ ওঠে। পক্ষে বিপক্ষে প্রচুর আবেদন জমা পড়ে। সব নাকচ করে আদালত মোট ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ বহাল রাখার নির্দেশ দেয়।

অসম ঃ

অসমে দুটি পৃথক সংরক্ষণ কোটা রয়েছে বিভিন্ন জনজাতিগোষ্ঠীর জন্য। সরকারি চাকরিতে, অসম পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে যে নিযুক্তি হয় সেখানেও সংরক্ষণের ভাগাভাগিটা এরকম —এস সি ৭ শতাংশ, এস টি (সমতলের) দশ শতাংশ, এস টি (পার্বত্য এলাকার) ৫ শতাংশ, ও বি সি এবং এস ও বি সি ২৭ শতাংশ, শারীরিক প্রতিবন্ধী-তিন শতাংশ— সব মিলিয়ে হয় ৫২ শতাংশ। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ডাক্তারী ও ইঞ্জিনীয়ারিং সহ তপশীলি জাতির জন্য ৭ শতাংশ, সমতলে বসবাসকারী তপশীলি উপজাতিদের জন্য দশ শতাংশ, পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী তপশীলি উপজাতিদের জন্য পাঁচ শতাংশ, ১৫ শতাংশ ও বি সি/মেজর ও বি সি, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য তিন শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে চল্লিশ শতাংশ।

সরকারি সংস্থায়ও কোটা নির্দিষ্ট আছে —প্রাক্তন সরকারি কর্মীদের ছেলেমেদের জন্য ইঞ্জিনীয়ারিং এবং পলিটেকনিক-এ

তরুণ গগৈ

একটি করে আসন সংরক্ষিত। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বংশধরদের জন্য প্রত্যেক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে একটি করে আসন এবং পলিটেকনিকে দুটি করে আসন সংরক্ষিত আছে। আবার, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একটি করে আসন এবং পলিটেকনিক গুলোতে সংরক্ষণের পরিমাণ তিন শতাংশ। এছাড়া চা-বাগানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একটি আসন এবং পলিটেকনিক কলেজে দুটি করে আসন সংরক্ষিত আছে। তবে এসবই ওই ও বি সি/মেজর ও বি সি-দের জন্য প্রদত্ত ১৫ শতাংশের মধ্যেই গণ্য হবে। রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী ক্রীড়াবিদ (ছেলে-মেয়ে)-দের জন্য একটি করে আসন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এবং পলিটেকনিকে সংরক্ষিত আছে।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ

এই প্রদেশে সরকারি চাকরিতে তপশীলি জাতির জন্য ২২ শতাংশ, তপশীলি উপজাতির জন্য ছয় শতাংশ এবং ও বি সি-দের জন্য সাত শতাংশ সংরক্ষিত। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রেও তপশীলি জাতির প্রার্থীদের জন্য ওই ২২ শতাংশ এবং তপশীলি উপজাতিদের জন্য ছয় শতাংশ আসন সংরক্ষিত আছে। আগে শিক্ষাক্ষেত্রে ও বি সি-দের জন্য কোনও সংরক্ষণই ছিল না। বিধানসভা চলতি অধিবেশনে (জুন-জুলাই-'১০) একটি বিল পাস করে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ও বি সি-দের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।

সাচার কমিটির রিপোর্ট পেশের পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ বাবু ৩৩ বছর বাদে হঠাৎ জেগে উঠে দেখেন রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমান সরকারি কর্মী অনেক কম! তড়িঘড়ি বামফ্রন্ট সরকার মুসলমানদের জন্য সরকারি চাকরিতে দশ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা করে দেন। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে কোনও গোষ্ঠীকে সংরক্ষণ দেওয়া ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী। সেজন্য বামফ্রন্ট সরকার পিছনের দরজা দিয়ে সংবিধান সংশোধন করে ও বি সি'র মধ্যে ৪৩ টি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে মুসলমান তোষণের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। গত ২রা জুলাই কলকাতা হাইকোর্ট এক জনস্বার্থ মামলায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেন। জনৈক কৃশানু মিত্র এবং অন্য কয়েকজন ওই মামলা দায়ের করেছিলেন। সরকারের দাবী এর ফলে রাজ্যের ২.২ কোটি মুসলমানের মধ্যে ১.২ কোটি মুসলমান ও বি সি হিসেবে সংরক্ষণের অধীনে আসবে। বেসরকারী হিসেবে আরও বেশি। উল্লেখ্য, স্বস্তিকা'র ১২ জুলাই সংখ্যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ ঃ

এখানে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশমতো এস সি/এস টি এবং ও বি সি-দের জন্য মোট সংরক্ষণের পরিমাণ ৫০ শতাংশ। সরকারি চাকরি এবং শিক্ষণ সংস্থায়, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত এবং শহরে লোকাল বডির নির্বাচনে তপশীলি জাতি, উপজাতি এবং ও বি সি-দের জন্য আসন সংরক্ষণের পরিমাণ যথাক্রমে ২১ শতাংশ, ২ শতাংশ এবং ২৭ শতাংশ। বর্তমানে মায়াবতীর নেতৃত্বাধীন বি এস পি দল পরিচালিত রাজ্য সরকার দশটি নতুন শ্রেণী তৈরি করেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সকল কন্ট্রাক্টে দলিতদের জন্য ২১ শতাংশ সংরক্ষণ করেছে। বিশেষ বিনিয়োগকারীদেরকে বলা হয়েছে, যদি তারা স্ট্যাম্প ডিউটিতে ছাড় পেতে চান তাহলে তপশীলি জাতি এবং ও বি সি-দের জন্য সুবিধা প্রদান করতে হবে।

মায়াবতী

বিজেপি সরকারকে বিপাকে ফেলার ষড়যন্ত্রে সোনিয়ার কংগ্রেস সরকার

তারক সাহা

গুজরাটে এক অসম লড়াই চলছে বিজেপি আর কংগ্রেসে। ২০02 সালে গোধরা পরবর্তী রাজনৈতিক লড়াইয়ে বারবার নাস্তানাবুদ কংগ্রেস। নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে যারপরনাই লড়াইয়ে মেতেছে বিরোধী রাজনৈতিক শিবির এবং তিস্তা শীতলাবাদের মতো এন জি ও গোষ্ঠীগুলি। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেনি এ যাবৎ। বরং বিভিন্ন কুৎসা অপপ্রচার সত্ত্বেও গোধরা ও গুজরাত দাঙ্গ ার পরবর্তী দু'-দুটো বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ধরাশায়ী এবং গত বিধানসভা নির্বাচনে সোনিয়া নরেন্দ্র মোদীকে "মৃত্যুর সওদাগর" আখ্যা দিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা সত্ত্বেও সমস্ত নিন্দুকের মুখে ঝামা ঘষে সসম্মানে উত্তীর্ণ বিজেপি সরকার। কিন্তু কেন এই সাফল্য? এই সাফল্যের মূল উৎস বিজেপি সরকার। কিন্তু কেন এই সাফল্য? এই সাফল্যের মূলে উন্নয়ন। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় গুজরাট দেশের এক নম্বর রাজ্য। এরাজ্যে গুজরাট দাঙ্গায় বিরোধী রাজনীতির মুখ ও মুখোশ কুতুবউদ্দিনকে নিয়ে এ রাজ্যে বামনাটক কম করেনি সিপিএম। রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে কুতুবউদ্দিনকে এরাজ্যে পুনর্বাসন দিতে চেয়েছিল বাম সরকার। কিন্তু কুতুবউদ্দিন সরাসরি তা প্রত্যাখান করে ফিরে গিয়েছে নিজের পেশায়, সেই দাঙ্গা বিধবস্ত মোদীর রাজ্য গুজরাটে। গুজরাটে মানুষ নরেন্দ্র মোদীকে ভোট দেয় মোদীর মুখ দেখে নয়, তাঁর কাজকর্ম ও তার সুষ্ঠু রূপায়ণ দেখে। এ রাজ্যে মমতা-বুদ্ধ কাজিয়ায় উন্নয়ন স্তব্ধ করে দিয়ে টাটারা চলে গিয়েছে সেই গুজরাটেই আর সেখানে রতন টাটাকে মোদী জায়গা দিয়েছেন এক দিনেই।

সুতরাং ঈর্ষায় জ্বলছে কংগ্রেস। দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। তেমনই কংগ্রেসের ছলের অভাব নেই। তাই সোহরাবউদ্দিনকে নিয়ে কংগ্রেসের 'কুম্ভীরাশ্রু' কেন তা একটু খতিয়ে দেখে যেতে পারে। আসুন দেখি, এই সোহ্‌রাবউদ্দিন ব্যক্তিটি কে?

সোহ্‌রাবউদ্দিন কোনও সাধারণ অনুগত নাগরিক নয়, বরং একজন দাগী অপরাধী। আর তার নেটওয়ার্ক শুধু গুজরাটে সীমাবদ্ধ নেই, তার জাল ছড়িয়ে আছে মহারাষ্ট্র, রাজস্থানের মতো পড়শী রাজ্যেও। আন্তর্জাতিক মাফিয়া ডন কুখ্যাত দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে তার সংযোগ ছিল এবং রসুল পার্তি, মামুমিয়াঁ, পাঞ্জুমিয়ার মতো স্মাগলারদের সঙ্গেও। মারাত্মক অস্ত্র সে চোরাপথে আমদানি করত পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশ থেকে। আমেদাবাদ ডি সি বি থানায় নথিভুক্ত মামলায় অভিযোগ রয়েছে যে, তার কাছ থেকে পাওয়া গেছে ২৪টি একে—৫৬ রাইফেল, ২৭টি হ্যাণ্ড গ্রেনেড, ৫২৫০টি কার্তুজ এবং ৮১টি ম্যাগাজিন। এত বিপুল অস্ত্র দিয়ে কমপক্ষে ৫০০০ মানুষ মেরে ফেলা যেত।

কাসভ ও তার সাকরেদরা তিনদিন ধরে দেশের অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বাইয়ের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল মাত্র তিনটি একে-৪৭ রাইফেল, ৩০টি হ্যাণ্ড গ্রেনেড, ৬০০ কার্তুজ, কয়েক কেজি আর ডি এক্স এবং তিনটি পিস্তল দিয়ে। এইসব অস্ত্র দিয়ে কাসভরা কেড়ে নিয়েছিল ১৭০ জন নিরপরাধ মানুষের জীবন। তাহলে সোহ্‌রাবউদ্দিনের কাছ থেকে যেসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে তা দিয়ে কতজন মানুষকে খতম করা যেত তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

১২টি ভয়ানক অপরাধে সোহ্‌রাবউদ্দিন ছিল পলাতক দাগী আসামী। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান— এই চার রাজ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধি, অস্ত্র আইন, কাস্টম্‌স্ আইনের বিভিন্ন ধারায় পুলিশ তাকে খুঁজছিল। এমনকী তার মৃত্যুর বিষয়ে মামলায় তার ভাই রতবাবউদ্দিনও আবেদনকারী হওয়া সত্ত্বেও সন্দেহের উর্দ্ধে নয়। সে জানত সোহ্‌রাবউদ্দিন কোথায় এবং সরকার তার মাথার দামও ঘোষণা করেছে।

এহেন এক দাগী আসামীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অযাচিত শোরগোল পাকাচ্ছে তথাকথিত সেকুলারিস্টরা। সুযোগ বুঝে সুর সপ্তমে চড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। মোদীর পিছনে সরকারি পোষা ফেউ সি বি আই-কে লাগিয়ে দিয়েছে সুপ্রীম কোর্টের আদেশের মোড়কে। সোহরাবউদ্দিন যে কতটা দাগী আসামী তা বিভিন্ন রাজ্যে আদালতগুলিতে তার ও তার সাকরেদদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির সত্যতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণা করেছে আদালতগুলি। এমনই কিছু আদালত দ্বারা ঘোষিত শাস্তি বিধানের অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো।

অভিযুক্ত নং (১) ইয়ুসুফ খান, (২) সিরাজমিয়া আকরমিয়া, সাজিদালি ওরফে ডেনি মহম্মদ আলি সঈদ সহ এমন ১০ জন অপরাধী যার মধ্যে সোহরাবউদ্দিনের নম্বর ছিল ২৬— এইসব অপরাধীদের মধ্যপ্রদেশের আদালত টাডা আইনের তিন ও পাঁচ নম্বর ধারা অনুযায়ী ৫-বছরের সশ্রম কারাদণ্ড সহ ৫০০ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, অস্ত্র আইনের ৭নং এবং ২৫ (১) এ ধারায়ও কারাদণ্ড দিয়েছে।

আমেদাবাদ নগরে ভেজালগুর থানায় সি আর-১১-২৩৮।২০০৭ নম্বর মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৩ বি, ২৫ (১) অস্ত্র আইনে আনীত অভিযোগগুলিতে বলা হয়েছে যে সোহ্‌রাবউদ্দিন ও তার সঙ্গীরা এক ব্যক্তিকে খুন ও খুনের ষড়যন্ত্রে দণ্ডিত হলে ধরা পড়ে, বাকি সঙ্গীরা পালিয়ে যায় পাকিস্তানে।

মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলায় চাঁদগড় থানায় কেস নং ৫২।২০০-এ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭, ১২০ (বি), ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯ এবং তৎসহ আরও ৫ জন ষড়যন্ত্রকারী। ২০০০ সালের ৮ নভেম্বর মোটর সাইকেল থেকে ওলড্ এস টি স্ট্যাণ্ডে গুলি ছুঁড়ে হত্যার চেষ্টা করে গুরুতর জখম করে। এই মামলায় আদালত তাকে ঘোষিত পলাতক অপরাধী ঘোষণা করে ছত্নক্তজপ্সন্তস্তুনপ্লন্দ্বস্তু খন্দ্রন্দ্রন্দ্ধস্তুন্দ্বক্তজগ্ন।

মধ্যপ্রদেশে উজ্জয়িনী জেলায় নাগদা থানায় কেস নং ২৩৭।৯৫-এ দণ্ডবিধির ১২২, ১২৩ এবং অস্ত্র বিক্রি করছিল। এই মামলাটি তদন্ত করে স্থানীয় পুলিশ ও সি বি আই।

উজ্জয়িনী জেলায় আরেকটি থানা মাহিদপুরে তার বিরুদ্ধে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগ আনা হয় দণ্ডবিধির ১২২, ১২৩ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ও ২৭ ধারায়। মামলাটি স্থানীয় পুলিশ ও পরে সি বি আই তদন্ত করে।

লাসুদিয়া থানায় কেস নং ৩৪৬/ ২০০৩-এ দণ্ডবিধি ৪১৯ ধারায় সোহ্‌রাবউদ্দিন ও তার সঙ্গী জুবেরভাইয়ের সঙ্গে ধরা পড়ে ভুয়ো নামের লাইসেন্সে মোটরসাইকেল চালানোর দায়ে। তাদের ও আরও দুই সঙ্গী যারা ওই ভুয়ো লাইসেন্স বের করে দেয় তাদের বিরুদ্ধে ও পুলিশ চার্জশীট দেয়।

১৯৯৯-এর ৬ জুলাই জাতীয় নিরাপত্তা আইনে সোহরাবউদ্দিনকে ধরা হয়। পরে জামিনে মুক্ত হলে সে পালিয়ে যায়।

সমীক্ষা অনুযায়ী, ৭১২টি পুলিশ এনকাউন্টার মামলার মধ্যে মাত্র ১৭টি মামলাই গুজরাটে ঘটেছে ২০০০ থেকে ২০০৭-এর মধ্যে। এনকাউন্টার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হল ঃ—

সাল	এনকাউন্টারের মোট সংখ্যা	অন্য রাজ্যে এনকাউন্টারের সংখ্যা	গুজরাটে এনকাউন্টারের সংখ্যা
২০০২	৫৫	উত্তরপ্রদেশ-৪৪	০
২০০৩	১১৮	উত্তরপ্রদেশ-৭৮ বিহার-০৮ অন্ধ্রপ্রদেশ-০৬ মহারাষ্ট্র-০৫	০২
২০০৪	১০৯	উত্তরপ্রদেশ-৬৮ অন্ধ্রপ্রদেশ-০৯ বিহার-০৫ মহারাষ্ট্র-০৪	০৪
২০০৫	৮৪	উত্তরপ্রদেশ-৫৪ বিহার-০৭ অন্ধ্রপ্রদেশ-০৫	০৬
২০০৬	৪৫	উত্তরপ্রদেশ-২৯ অন্ধ্রপ্রদেশ-০৩ বিহার-০৩	০৪
২০০৭	৩০১	উত্তরপ্রদেশ-৫১ অন্ধ্রপ্রদেশ-০৫ বিহার-১৬	
মোট	৭১২		১৭

নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ একান্তে।

রাজস্থানে উদয়পুর জেলায় হাতিপুল থানায় কেস নং ২১৪।০৪ তাং ৩১.১২.২০০৪-এ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩০২ এবং অস্ত্র আইনের ৩।২৫ অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনাটা হলো সোহরাবউদ্দিন ও তার ৬ সঙ্গীসাথী সুরজ পোলের (উদয়পুর নগরে) এক ব্যস্ত অঞ্চ লে হামিদ লতা নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করে। এই অপরাধীরা মোটর সাইকেলে চড়ে এসে হত্যা করে। ৭ জনের মধ্যে ২ জন ধরা পড়লেও ৫ জন পালিয়ে যায়।

মৃত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে সোহরাবউদ্দিনই। দায়রা আদালতে চার্জশিট দেয় পুলিশ। ১১.১.২০০৫-এ প্রশাসন সোহরাবউদ্দিনকে ধরে দেবার জন্য ফোর্সকে ২০০০ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করে। এই খবরটি সার্কুলারের মাধ্যমে রাজস্থানের সব থানায় জানিয়ে দেওয়া হয়। সোহ্‌রাবউদ্দিনের অপরাধের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় রাজস্থান পুলিশের সর্বোচ্চ কর্তা ২৭.১০.২০০৫-এ ২০ হাজার টাকা পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেন তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য।

॥ ২ ॥

সম্প্রতি দেশজুড়ে সোহরাবউদ্দিন মামলায় গুজরাটের মন্ত্রী অমিত শাহ-র গ্রেপ্তার নিয়ে খুব চাপান-উতোর চলছে রাজনৈতিক মহলে। অভিযোগ উঠছে, সোহ্‌রাবউদ্দিনের ভাই রতবাবউদ্দিনের অভিযোগের ভিত্তিতে চলা এক মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়কে হাতিয়ার করে সিবি আইকে ময়দানে নামিয়েছে সোনিয়ার কংগ্রেস এবং তা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং মোদী সরকারকে হেনস্থা করাই যে মূল্য লক্ষ্য তা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। প্রশ্ন হলো, কি ছিল রতবাবউদ্দিনের সেই অভিযোগ?

রতবাবউদ্দিন সুপ্রীম কোর্টে তার হলফনামায় সোহরাবউদ্দিনের অপরাধ এবং বিভিন্ন অপরাধে বিভিন্ন রাজ্যে তার নামে যেসব অভিযোগ রয়েছে কোথাও তার উল্লেখ করেনি। অথচ বিভিন্ন রাজ্যের অপরাধের তথ্য থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর কাছে ঝারানিয়া গ্রামের বাসিন্দা সোহরাবউদ্দিন অপরাধের পেশাকে বেছে নেয় ১৯৮৯ সালে ছোটা দাউদ ওরফে সারিফ খানের বে-আইনি মাদক দ্রব্যের পাচারকারী হিসেবে। এই সারিফ খান আবার কুখ্যাত আন্তর্জাতিক অপরাধী দাউদ ইব্রাহিমের সাকরেদ। সারিফখানের মাধ্যমে হাতেখড়ি হলেও পরে সোহ্‌রাবউদ্দিন গিয়ে ভেড়ে আরেক কুখ্যাত আমেদাবাদ নিবাসী ভয়ানক অপরাধী ও দাউদ ঘনিষ্ঠ আব্দুল লতিফ শেখের দলে এবং ১৯৯৩ সালে মুম্বাই বিস্ফোরণে এই আবদুলের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মুম্বই সংলগ্ন বলে গুজরাট পুলিশ তৎপর হয়ে যাওয়ায় এই রাজ্যে দাউদ প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র কাজে লাগাতে পারেনি দাউদ ঘনিষ্ঠরা। এই আবদুল লতিফ-ই সোহ্‌রাবউদ্দিনের জিম্মায় রাখে ২৪টি একে-৪৭ রাইফেল ও ১০০টি হ্যান্ড গ্রেনেড সহ বেশ কয়েকটি পিস্তল ও গুলি-বারুদ যা মধ্যপ্রদেশে তার পুরাতন আস্তানায় লুকিয়ে রাখে সোহ্‌রাবউদ্দিন। পরে এক কুঁয়ো থেকে পুলিশ এইসব অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ধার করে।

রতবাবউদ্দিন কিন্তু তার এমন গুণধর ভাইয়ের কীর্তি সযত্নে এড়িয়ে গেছে সুপ্রীম কোর্টে। সুপ্রীম কোর্ট মুসলীম তোষণকারী কিছু এন জি ও এবং রতবাবউদ্দিনের

(এরপর ৯ পাতায়)

গুজরাটের বাস্তব অবস্থা

বলবীর পুঞ্জ

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী ও পুলিশ অফিসারদের নিয়ে তথাকথিত সেকুলারবাদী রাজনৈতিক নেতা, একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যম এবং মানবাধিকারবাদীরা বিতর্ক, বদনাম করেই চলেছেন। থামার কোনও লক্ষণ নেই। এক একজনের কেস-হিস্ট্রি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক কে নায়ক আর কে খলনায়ক।

মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঃ কোনও অপরাধমূলক ঘটনা বা পৃষ্ঠভূমি (background) নেই। ২০০২-এ গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসের করসেবকদের কামরায় জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার পর গুজরাটে দাঙ্গা হয়। তখন থেকেই মোদী সেকুলারবাদীদের চক্ষুশূল। গত আটবছর তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। বিগত দশবছর ধরে উন্নয়নমূলক কাজের নিরীখে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যের জনগণের অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র বলে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। নিজের কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই— 'ভাঁড়ে মা ভবানী'। দূরদৃষ্টি এবং ব্যাপক উন্নয়নের সফল পরিকল্পনাকার— এই দৃষ্টিতে দেশে-বিদেশে প্রভূত প্রশংসা কুড়িয়েছেন। উন্নয়নের মাপদণ্ডে গুজরাট ভারতে সবার আগে। অনেক রাজ্যই গুজরাটের উন্নয়নের মডেলকে অনুকরণ করছে। মোদীর প্রশংসকদের মধ্যে বর্তমান শাসকদলের অনেক বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাও আছেন। উন্নয়নের সবকটি মাপদণ্ডেই গুজরাট এগিয়ে রয়েছে। সর্বাধিক পরিমাণ বিনিয়োগও গুজরাটে হয়েছে। রাজ্য জেহাদী ইসলাম ও নকশালী হিংসা থেকে মুক্ত।

অমিত শাহ ঃ আমেদাবাদ থেকে পরপর চারবার বিধায়ক। জয়ের ব্যবধান—২০০২-এ এক লাখ ৮৫ হাজার আর ২০০৭-এ ২ লক্ষ ৩৫ হাজার। কোনও অপরাধমূলক পটভূমি বা ব্যাকগ্রাউণ্ড (Criminal Record or background) নেই। সার্বজনিক জীবনে সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতিতে সক্রিয়। নরেন্দ্র মোদী সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইনের প্রধান পরিকল্পনাকার। তথাকথিত সোহরাবউদ্দিন - ভুয়ো সংঘর্ষ মামলায় প্রধান অভিযুক্ত। বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে সবরমতী জেলে বন্দি।

সোহরাবউদ্দিন ঃ আণ্ডারওয়ার্ল্ড মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিম এবং লতিফের মতো দেশদ্রোহীদের সাকরেদ। মৃত্যুর পর তার 'মানবাধিকার' নিয়ে আলোচনা চলছে। ১৯৮৯ সালেই ছোট দাউদ ওরফে শরীফ খান-এর ড্রাগ চোরাচালানে যুক্ত হয়ে অপরাধজগতে প্রবেশ। ১৯৯৪ সালে রথযাত্রা বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্রে মূল আসামী। তার ক্ষেতের কুয়ো থেকে ২৪টি এ কে ৫৬ রাইফেল, ২৭টি হ্যাণ্ডগ্রেনেড, ৫২৫০টি কার্তুজ এবং ৮১টি ম্যাগজিন বাজেয়াপ্ত হয়েছে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে তার বিরুদ্ধে হত্যা, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ইত্যাদি দেশবিরোধী ডজন ডজন মামলা ঝুলছে। 'টাডা' আইনে পাঁচবছর কারাবাসের পর জামিনে মুক্ত। তার তথাকথিত স্ত্রী কৌসর বিবি নিজের স্বামী ও তিন পুত্র-কন্যাকে ছেড়ে সোহরাবউদ্দিনের সঙ্গে বসবাস করত। ২৬ নভেম্বর, ২০০৫-এ গুজরাটের এ টি এস (অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড), রাজস্থান এবং অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের যৌথ অভিযানে এক সংঘর্ষে তার মৃত্যু হয়। সেকুলারবাদীরা এনকাউন্টারকে ভুয়ো বলে শুধুমাত্র গুজরাট সরকারকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে।

সি বি আই ঃ সরকারের হাতের 'কাঠপুতুল'—এরকম মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে। ঠাট্টা করে রাজনীতির নেতা-কর্মীদের কথায় 'কংগ্রেস ব্যুরো অফ্ ইনভেস্টিগেশন' বলেই বলা হয়। সি বি আই-এর একদা যুগ্ম নির্দেশক বি আর লাল তাঁর বই 'হু ওন্স সি বি আই— দ্য নেকেড ট্রুথ'-এ অনেক কিছু খোলসা করে বলেছেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের জন্য সরকারপক্ষের হাতে ব্রহ্মাস্ত্র। ইউ পি এ-সরকারের দ্বিতীয় দফায় সর্বাধিক দুরুপযোগ হয়েছে। সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চাকে ঠাণ্ডা করার মোক্ষম দাওয়াই সি বি আই।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকারের সি বি আই-কে অপব্যবহার করার ইতিহাস পুরানো এবং দীর্ঘ। সত্তরের দশকে বিহারের কংগ্রেস নেতা এল এন মিশ্র হত্যাকারীদের হাতে নিহত হন। সরকারের ইশারায় গত ৩৬ বছর ধরে তদন্ত চালু রয়েছে। মৃতের ভাই এবং বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্রের উঁচু দরের ষড়যন্ত্র বলে তদন্ত দাবী করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত দোষীকে কখনওই সামনে তুলে ধরা হয়নি। বোফর্স কামান কেনাতে দালালির অভিযোগ উঠেছিল রাজীব গান্ধীর ঘনিষ্ঠদের নামে। কিন্তু দালালির প্রধান অভিযুক্ত কত্রোচ্চিকে ভারত থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ফেরৎ আনার জন্য কোনওরকম চেষ্টাই করা হয়নি। উল্টে কত্রোচ্চির বিরুদ্ধে জারি করা 'রেড কর্ণার নোটিশ' তুলে নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, তার সীল করে দেওয়া ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলে দেওয়ার জন্য দেশের আইনমন্ত্রী বিশেষ দূত পাঠান। সি বি আই এসব ব্যাপারে কোনও আপত্তি জানায়নি। সি বি আই-এর অপব্যবহারের সর্বশেষ উদাহরণ ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশের ঘটনা। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য কখনও শিবু সোরেনের বিরুদ্ধে চিরুডি হত্যাকাণ্ড মামলা, কখনও মুলায়ম-মায়াবতীদের বিরুদ্ধে আয়ের চেয়ে অনেক বেশি সম্পত্তি রাখার মামলা শুরুর 'নাটক' শুরু করা হয়েছিল।

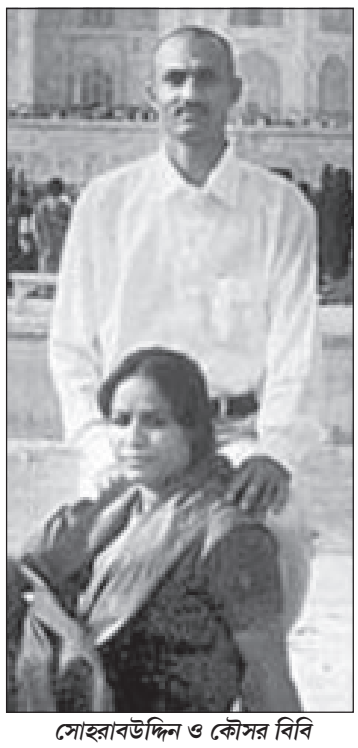

সোহরাবউদ্দিন সংঘর্ষ (এনকাউন্টার)-এর তদন্ত সি বি আই-কে দিয়ে করানোর পক্ষে ভারতের মহা-অধিবক্তা (সলিসিটর জেনারেল) তখন যুক্তি দেখিয়েছিলেন, যেহেতু সংঘর্ষের ঘটনায় অন্ধ্রপ্রদেশ এবং রাজস্থানও যুক্ত সেজন্য গুজরাটের সি আই ডি-র পক্ষে তদন্ত করা অসম্ভব। অতএব, সি বি আই-ই এক্ষেত্রে তদন্ত করতে পারে। কিন্তু সি বি আই এখনও পর্যন্ত রাজস্থান অথবা অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশকে কোনওরকম জিজ্ঞাসাবাদই করেনি। কেন? এছাড়াও সি বি আই সেইসব মাটি-মাফিয়া এবং দাগী অপরাধীদেরকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাচ্ছে যাদেরকে অমিত শাহ অবৈধ কাজকর্মের জন্য কারাগারের পথ দেখিয়েছিলেন।

সোহরাবউদ্দিন ও কৌসর বিবি

সোহরাবউদ্দিন সংঘর্ষ মামলার ইতিহাস ঃ সোহরাবউদ্দিনের ভাই রুবাবউদ্দিন গত ২১ জানুয়ারি, ২০০৬ প্রধান বিচারপতিকে একটা চিঠি লেখেন। এর ফলে অবস্থা জানতে আদালত গুজরাটের পুলিশ মহানির্দেশককে এক নোটিশ পাঠান। গুজরাট সরকারের পক্ষে গীতা জোহরী এবং মুকুল রোহতগী সরকার যে সব দণ্ডমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে তার পুরো বর্ণনা দিয়েছেন। বরখাস্ত করা এবং গ্রেপ্তার হওয়া পুলিশ অফিসারদের তালিকাও দিয়েছেন। এরপর গত ১০ জানুয়ারি, ২০১০ সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদ্বয় তরুণ চ্যাটার্জী এবং আফতাব আলমের বেঞ্চ সি বি আই-কে তদন্তের দায়িত্ব দেন। এই সিদ্ধান্তের একদিন বাদেই বিচারপতি চ্যাটার্জী অবসর গ্রহণ করেন। বিচারপতি চ্যাটার্জীর নামে ইতিপূর্বেই গাজিয়াবাদ পি এফ কেলেঙ্কারিতে উঠে এসেছে। এই কেলেঙ্কারিতে প্রধান অভিযুক্ত আশুতোষ অস্থানা মৃত্যুর আগে তাঁর বয়ানে চ্যাটার্জীর নাম বলে দেন। অস্থানা চ্যাটার্জীর কোলকাতার বাড়িতে দুটি এসি এবং অনেকগুলি দামী মোবাইল উপহার দেওয়ার কথা কবুল করেন। মোট ৩৩ জন বিচারপতির নাম ওই কেলেঙ্কারিতে উঠে এসেছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই বিষয়ে সি বি আই যখন আদালতে চার্জশীট দাখিল করে সেখানে তরুণ চ্যাটার্জির নামই নেই।

তথাকথিত মানবাধিকারবাদীদের ভূমিকা ঃ রাষ্ট্রীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে ২০০২ থেকে ২০০৭-এর মধ্যে সারা দেশে মোট ৭১২টি সঙঘর্ষের (এনকাউন্টার) ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে গুজরাটের ঘটনার সংখ্যা মাত্র ১৭টি। কমিশনের ২০০৬-এর ৩১ মার্চের রিপোর্ট অনুসারে কমিশনের কাছে মোট ৪৪০টি এনকাউন্টারের ঘটনা বিচারাধীন। তার মধ্যে মাত্র পাঁচটি ঘটনা গুজরাটের। এছাড়া উত্তরপ্রদেশের ২৩১টি, রাজস্থান-৩৩, মহারাষ্ট্র-৩০, অন্ধ্রপ্রদেশে-২২টি, অসমের ১২টি এনকাউন্টারের ঘটনা কমিশনের বিচারাধীন রয়েছে। কেবলমাত্র গুজরাটে এত সক্রিয়তা কিসের কারণে? কেন?

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে গুজরাটের প্রকৃত অবস্থা বোঝা কী খুবই কঠিন? গুজরাটে লস্কর-এ-তৈবার চার জঙ্গি সংঘর্ষে নিহত হয়েছিল। যাদের একজন ইসরত জাহান। সেক্যুলারবাদীদের মতে সে নির্দোষ ছিল। সম্প্রতি আমেরিকায় ধৃত হেডলি স্বীকার করেছে, ইসরত জাহান লস্কর-এর জঙ্গি ছিল। যে দেশে ইসরত জাহান এবং সোহরাবুদ্দিনের মতো সন্ত্রাসবাদীদের সংঘর্ষে মৃত্যুকে মানবাধিকার হননের রোল মডেল হিসেবে খাড়া করা হয়, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করে সেই দেশভক্তদের অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হয়, সেই দেশের নিরাপত্তা কোথায়?

[লেখক বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক ও বিজেপি-র সাংসদ]

ভাববার কথা

● ২০০২ থেকে ২০০৭-এই ৫ বছরে সারা দেশে ৭১২টি এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটে। যদি প্রত্যেক এনকাউন্টার কেসের ফাইল পুনরায় খোলা এবং তদন্ত করা হয় তবে কি ঘটবে ভাবা যায়?

● সীমান্তবর্তী রাজ্য গুজরাটকেই শুধু আক্রমণের লক্ষ্যবিন্দু হিসেবে বেছে নেওয়া হচ্ছে কেন? সোহরাবুদ্দিনের মতো একজন ভয়ংকর ক্রিমিনালের পক্ষে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যার অভিযোগ এনে যাঁরা সরব তাঁরা কি প্রকারান্তরে দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল এবং সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদের অনুপ্রবেশে মদত দিয়ে আরও বিপজ্জনক করে তুলেছেন না?

● গুজরাটে সংঘটিত মাত্র কয়েকটি এনকাউন্টার আক্রমণ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের এত কান্না-কাটি কেন? যেখানে শ'য়ে শ'য়ে অপরাধী, সন্ত্রাসবাদীদের গত কয়েক বছরে গ্রেপ্তার করেছে গুজরাট পুলিশ এবং তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রেই এই ধরনের এনকাউন্টার হয়েছে।

● আমেদাবাদে ২০০৭-এ সিরিয়াল বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটির সমাধানের পর দেশজুড়ে এই ধরনের অনেকগুলো ঘটনার সমাধান হয়। যে অফিসারেরা এখন জেলে আছেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য অভিযুক্ত সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলো ভাঙতে কেবলমাত্র তাঁরাই সমর্থ হয়েছেন।

● গুজরাট পুলিশ তৃতীয় কোনও পক্ষকে আড়াল করার চেষ্টা করছে— এই অভিযোগের স্বপক্ষে সি বি আই একটি প্রমাণও দাখিল করতে পারেনি। যদি তারা সত্যিই তৃতীয় পক্ষকে চিহ্নিত করে থাকে, তবে তার নামটা এবং সমগ্র ঘটনায় তার ভূমিকাটা প্রকাশ্যে বলে দিতে আটকাচ্ছে কোথায়?

● অন্ধ্র পুলিশকে চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়নি গুজরাট পুলিশ। অথচ সি বি আই কেন্দ্রীয় সংস্থা হয়েও নাকি তাদের চিহ্নিত করবে। কি ঘটেছিল? এখনও পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশের একজনও পুলিশ আধিকারিককে চিহ্নিত করতে পারেনি সি বি আই। না কি শাসক কংগ্রেসের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে ইচ্ছাকৃতভাবে একজন অভিযুক্তকেও ধরছে না তারা?

ষড়যন্ত্রে সোনিয়া কংগ্রেস

(৮ পাতার পর)

আবেদনের ভিত্তিতে সি বি আই তদন্তের নির্দেশ দেয় একেবারে ভুলপথে পরিচালিত হয়েই। বাস্তব ঘটনা (Material Fact)-কে কার্যত উপেক্ষা করেই। রতবাবউদ্দিন সর্বোচ্চ আদালতকে তার ভাইয়ের নামে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন আদালতে যে অজস্র মামলা চলছে তার কথা আদৌ জানায়নি। শুধু তাই নয়, সোনিয়া কংগ্রেস সি বি আইকে কাজে লাগিয়েছে গুজরাটের সৎ ও নিষ্ঠাবান বলে পরিচিত যেমন ডি জি বানজারা, জি এল সিঙঘল, অভয় চৌদাসমা-র মতো দুঁদে পুলিশ অফিসারদের মিথ্যা সোহরাবউদ্দিন হত্যা মামলায় ফাঁসিয়ে এবং তাদের তিন বছর ধরে জেলে পুরে রেখে। উল্লেখ্য, এইসব অফিসারদের সচেষ্ট প্রয়াসে অনেক সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটনা ঘটবার আগেই প্রতিহত করা হয়েছে। বিচারের বাণী এভাবেই নিভৃতে কাঁদে এদেশে কেবল রাজনীতির ফায়দা লুঠতে। এ বিষয়ে পাঞ্জাব আতঙ্কবাদীদের ত্রাস কে পি এস গিল (যাঁকে শুনতে হয়েছে 'ট্রিগার হ্যাপি' অফিসারের অপবাদ)-র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ "The actual truth in a police encounter in generally known to law enforcement agencies, but still if they contritelly then it affects the moral of security forces fighting terrorists". সন্ত্রাসবাদ দমনের কাজ একেবারেই পুলিশ প্রশাসনের। এখানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গিল। পুলিশ-প্রশাসন যদি নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে না পারে তবে তা বাহিনীর নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে।

আর কংগ্রেস বেছে বেছে ঠিক এই কাজটিই করছে। ডি জি বানজারার মতো সৎ পুলিশকর্মীদের হেনস্থা গুজরাটে পুলিশ বাহিনীর নৈতিকতাকে খতম করার এক সুকৌশল চক্রান্ত। তথ্য বলছে যে, ২০০৭

(এরপর ১৪ পাতায়)

বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি

একদিকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে এক শ্রেণীর মানুষকে নিখরচায় অঘোষিত বিদ্যুৎ বন্টন, অন্যদিকে কর্মকর্তাদের বাবু মানসিকতার শ্রীবৃদ্ধি র জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ও বন্টন পরিষেবার জন্য ঠিকাদারি প্রথার রূপায়ণ;এর ফলে, পশ্চি মবঙ্গ সরকার নামক 'বিদ্যুৎ গ্রাহক শোষণ সমিতি'র ঘোষিত ও অঘোষিত মূল্য বৃদ্ধি গ্রাহকগণকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। এই বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করলেও বর্তমান পশ্চি মবঙ্গ সরকারের পক্ষে বিদ্যুৎ পরিষেবায় কোনও রকম পরিবর্তন করার মতো যে সরকারী পরিকাঠামো নেই, তা ভুক্তভোগীগণ ভালভাবেই জানেন। এর বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো গণআন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও গ্রাহকগণের সেদিকে কোনও আগ্রহ নেই। কারণ, বর্তমান সরকারের সামনে কোনও রকম প্রতিবাদ বা প্রতিকারের জন্য আন্দোলন করা পন্ডশ্রম ছাড়া যে আর কিছুই নয়, তা গ্রাহকদের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করলেই বোঝা যায়। তাঁরা বলেন, একটি অকর্মণ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে সরকারী পরিকাঠামোটি পরিবর্তনের জন্য নির্বাচনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করাই ভাল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি র প্রতিবাদ জানাতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দিকেই নজর রেখেছেন বিদ্যুৎ গ্রাহকগণ। তবে সরকারী পরিকাঠামোয় ৩৩ বছরের বামপন্থী শাসন ব্যবস্থায় যে আবর্জনার পাহাড় জমেছে, তা পরিস্কার করতেই আগামী দিনের নূতন সরকারকে হিমসিম খেতে হবে। তাই সাধারণ মানুষকে পরিবর্তনের পরেও কিছুদিন ভুলের মাসুল গুণতে হবে। বিগত পঞ্চ ায়েত পুরসভা নির্বাচনে যে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে তার সুফল যেমন আমরা এখনও উপলব্ধি করতে পারছি না, সরকার পাল্টালেও বিদ্যুৎ পরিষেবায় পরিচ্ছন্নতা ফিরিয়ে আনতে একটু সময় লাগবে। এর আর একটি প্রধান কারণ হলো, পশ্চি মবঙ্গে বামফ্রন্ট নেতৃত্বাধীন সিপিএম সরকার প্রবর্তন করেছে এক নব্য কমিউনিস্ট প্রথায় ধনতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের নাটক। এই নাটকে তান্ত্রিকগণ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের রূপান্তর ঘটিয়ে নাম রেখেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড। সবচেয়ে মজার ঘটনা হলো, সিপিএম সরকারের এই বিদ্যুৎ নাটকের মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারণে বেশি লাভবান হয়েছে সি ই এস সি। তাদের উন্নত বিদ্যুৎ পরিষেবায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি র কোনও প্রয়োজন ছিল না। তবুও পশ্চি মবঙ্গ সরকারের সম্মান রক্ষার জন্য বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি করে বিধস্ত পশ্চি মবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে লাল বাতি জ্বেলে রাখতে সহযোগিতা করেছেন। যদি এই সংস্থার উন্নত পরিষেবার জন্য কখনও তাদের ডাক পড়ে। যাই হোক, "সবুরেই তো মেওয়া ফলে"। বাংলার এই প্রবাদ বাক্যটিই হয়তো এখন সি ই এস সি-র ভরসা।

—শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোক নগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

সাঁইথিয়ায় রেল দুর্ঘটনা

রেলমন্ত্রক কেন্দ্রিয় সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক। রেল হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণ। ভারতীয় রেলের বৈপ্লবিক ভূমিকা আছে। রেলের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিভিন্ন কাজে যাতায়াত করেন। আজ রেলে যাত্রী সুরক্ষা বিঘ্নিত। ঘন ঘন রেল দুর্ঘটনা এটাই প্রমাণ করে। মানুষ এখন ট্রেনে যেতে ভয় পাচ্ছে। রেলমন্ত্রী প্রায় প্রতিদিন বাংলায় একাধিক ট্রেনের উদ্বোধন করছেন। অথচ রেলের সেই পরিকাঠামো নেই বহন করার। রেলে প্রায় লক্ষাধিক পদ শূন্য—নিয়োগের কোনও ব্যবস্থা নেই। কর্মে গাফিলতি, শৃঙ্খলাবোধের অভাব এবং যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ এখন অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। সম্প্রতি রেলে দুটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং আহত ব্যক্তিদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।

অতীতে রেলমন্ত্রী এন ডি এ আমলে এক তুচ্ছ কারণে কেন্দ্রিয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি দুটি মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনার পরেও নৈতিক কারণে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত ছিল। কিন্তু গত ২১ জুলাই, ২০১০ তিনি ঘোষণা করলেন যে সেবারে তাঁর পদত্যাগ করা ভুল হয়েছে। আর সেই ভুল তিনি করতে চান না। রেলদপ্তর হাতে নিয়ে বেশিরভাগ সময় তিনি বাংলায় রাজনীতি করবেন, মাঝে মাঝে কিছু চমক দেবেন, এভাবে তো রেলদপ্তর চলতে পারে না। দুটি মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনার জন্য কারা দায়ী সে বিষয়ে সি বি আই এবং রেল বোর্ড তদন্ত করছে। রেল দুর্ঘটনায় নাশকতার কারণ দেখিয়ে সি পি আই (এম)-এর উপর দোষ চাপিয়ে দিলেন। সি পি আই (এম)-এর 'বি' টিম কংগ্রেস হঠাৎ তৃণমূলের দোসর হয়ে গেল। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যজনক অবস্থা। যেখানে তদন্ত চলছে, সেখানে অবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্য না করাই বাঞ্ছনীয়। প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হোক। এক, মানুষকে জানানো হোক কি কারণে ঘন ঘন রেলে দুর্ঘটনা ঘটছে এবং রেলমন্ত্রী এর প্রতিকারের জন্য কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন বা নিচ্ছেন? ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে সে ব্যাপারে রেলমন্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

—আশিষ রায়, বি. গার্ডেন, হাওড়া।

তীর্থকর

অতি সম্প্রতি তৃণমূল নেত্রী মমতা নিজের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তারকেশ্বর ও গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রায় হিন্দুদের তীর্থকর প্রত্যাহার করে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের জন্য বাজারী সংবাদপত্রগুলি তার জয়গানে মুখর। কিন্তু ফুরফুরা শরীফের উরুশ উপলক্ষে তিনি রেল দপ্তর থেকে ভর্তুকি দিয়েও ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করেন। চেকিং ব্যবস্থায় বিরাম এনে বিনা টিকিটে 'উরুশ'-এ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেন। যিনি স্রেফ জনপ্রিয়তার জন্য হাওড়া-সিঙুর আন্দোলন স্পেশাল চালু করতে পারেন তিনি কি তারকেশ্বরে আগত এই বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর কথা ভেবে কিছু অতিরিক্ত লোকাল ট্রেনের ব্যবস্থা করতে পারতেন না?

প্রকৃতপক্ষে জনপ্রিয়তার শিখরে থাকা নেত্রী মমতা লোকদেখানো কিছু হিন্দুস্বার্থ রক্ষাকারী পদক্ষেপ নিলেও তার প্রধান লক্ষ্য মুসলমান ভোট। তাই তিনি উরুষ উপলক্ষেও অতিরিক্ত ট্রেনের ব্যবস্থা করেন। মুসলিমদের বিনা পয়সায় রেলের পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপের ব্যবস্থা করে দিয়ে, তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং অবশেষে নিজ পদবী ত্যাগ করেও মুসলিম ভোট পেতে তৎপর। তাই তারকেশ্বরে আগত বিশাল সংখ্যক পুণ্যার্থীর সাহায্যার্থে কয়েকটি অতিরিক্ত লোকাল ট্রেনের ব্যবস্থা করতে তিনি অপারগ!

—রাজু হালদার, হালাড়া, জামালপুর, বর্ধমান।

রাজনৈতিক জ্ঞানের সাময়িক অভাব

স্বস্তিকায় ৬২ বর্ষ ৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত জনমত-এ দেবীপ্রসাদ রায়ের লেখা "রাজনৈতিক জ্ঞানের সাময়িক অভাব" নিবন্ধে শ্রী রায়ের মতামত যথার্থ এবং তিনি সঠিক ভাবে তা বিশ্লেষণ করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোটি কোটি দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর বিজেপি সম্বন্ধে মুল্যায়ন একই। দেশবাসী কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে বিজেপি-কে বেছে নিয়েছিল। সফলতার সাথে শ্রদ্ধেয় অটলবিহারী বাজপেয়ীজীর নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার মাত্র সাড়ে ছয় বছর দেশ পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে বিজেপি তাদের সফলতার দিকগুলি যা দেবীপ্রসাদ রায় উল্লেখ করেছেন সাধারণ মানুষের কাছে তা জোরালো ভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে।

আমরা মনে করি, এখনও সময় আছে বিজেপি নেতৃত্ব যদি তাদের দুর্বলতা এবং ভ্রান্তিগুলি কাটিয়ে এন ডি এ সরকারের সফলতাগুলি জোরালো ভাবে প্রচার এবং সাথে সাথে ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনের ব্যর্থতা, বঞ্চ না, লাঞ্ছনা, অপশাসন, দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে তুলে ধরে তাহলে সাফল্য আসবেই । রাজপথই রাজনীতিতে বিজয়ের শেষ কথা এবং প্রধান উপায়। বিজেপি-এর সমস্ত নেতা নেত্রী কর্মী সবাইকে রাজপথে নামতে হবে। তখনই আমজনতার সাহায্য পাওয়া যাবে।

আজ কিন্তু সুযোগ এসেছে পশ্চি মবাংলায় সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি-এর মজবুত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে, বাংলার মানুষের মনে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালাতে হবে। এই জন্য দরকার আজ সাভারকর-হেডগেওয়ার-শ্যামাপ্রসাদের মতো প্রগতিশীল নেতৃত্ব।

—শ্রী চন্দন, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

'পথের পাঁচালীর' অমর স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র সু-সাহিত্যিক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক প্রয়াণ ঘটল গত ১৮ জুলাই। যকৃতের কঠিন রোগে তারাদাস বেশ কিছুদিনই আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু দারুণ রোগ-যন্ত্রণা ভুলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী অব্যাহত রেখেছিলেন। তারই ফসল 'সপ্তর্ষির আলো', 'বন্ধু, রহো রহো', 'তৃতীয় পুরুষ' প্রমুখ। এর মধ্যে বিভূতিভূষণের অসমাপ্ত উপন্যাস 'কাজল'-এর সম্পূর্ণ রূপদান, তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার অনন্য কীর্তি। 'কাজল' পড়তে পড়তে মনে হয় আমরা যেন বিভূতিভূষণকেই সামনে দেখতে পাচ্ছি। এমনই এক সার্থক লেখনীর অধিকারী হয়েছিলেন তারাদাস।

'পথের কবি' বিভূতিভূষণ চলে যান মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে। তারাদাস তখন ছোট্ট শিশু। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিও অনুকূল ছিল না! সেই অবস্থায় জননী রমা দেবী ছোট্ট শিশুকে প্রকৃত 'মানুষ' হিসেবে গড়ে তোলেন। এই ক্ষেত্রে জননী যে-স্থৈর্য ও ধৈর্যের পরিচয় দেন, তা বর্তমান সমাজ-সংসারে দুর্লভ ও অকল্পনীয়। এই সময়কার কথা তারাদাস কোনও কোনও সাহিত্য সভায় উল্লেখ করতেন, পরবর্তীকালে এই ধরণের সভাতেই রহস্য করে বলতে শুনেছি, 'আমি বাবার ৫৬ বছর বয়স পেছনে ফেলে এসেছি!'

বর্তমান পত্রলেখকের একবার সাহিত্যিকের সঙ্গে ব্যারাকপুরের 'আরণ্যক' আবাসে আলাপ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। লক্ষ্য করলুম সদালাপী, নিরহঙ্কার তারাদাস মনেপ্রাণে ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুরাগী। তারই প্রকাশ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ধারাবাহিক রচনা পিতৃজীবন নিয়ে 'পিতা নোহসি'। বিভূতিভূষণের কথা বলতে গিয়ে মরমী তারাদাস ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্ম সাধনাকেই ঔপনিষদিক চেতনার আলোকে তুলে ধরেছেন অণনুকরণীয়, সুললিত ও সাবলীল ভঙ্গীতে। পড়তে পড়তে পাঠককে মুগ্ধ ও আপ্লুত হতে হয়। তাঁর অকাল প্রয়াণে এই ভিন্ন ধরনের জীবনী রচনা অসমাপ্ত রয়ে গেল! আমাদের দেশের শিক্ষা, ভাবনা-চিন্তা, সংস্কৃতির সুস্থ চর্চার মানুষ আজকাল পরিতাপজনক হলেও কমে গেছে। তাই 'অমৃতপথযাত্রী' তারাদাসের আকস্মিক প্রয়াণ সেই শূন্যতার আরও বিস্তৃতি।

—রণজিৎ সিংহ, কলকাতা।

ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ

একজন প্রকৃত দেশপ্রেমী ও জাতীয়তাবাদী তথা বরেণ্য নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিধি নিরূপণ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তবুও ভারতমাতার এই বীর সন্তানের অতুলনীয় দেশাত্মবোধ, শিক্ষা সংস্কৃতি ও কর্মময় মহান জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে স্বস্তিকার শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যায় উল্লেখিত ও বিশ্লেষিত প্রতিবেদনগুলো যথার্থ ও বাস্তবসম্মত। এক কথায় শ্যামাপ্রসাদের অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব ও যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনে স্মরণ সংখ্যাটির তাৎপর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আসলে এই মহান্ রাষ্ট্রনায়কের জীবনের মূল্যবোধ ও চিন্তাধারাকে জনমানসের অন্তরালে রাখা নতুন কিছু ঘটনা নয়। কিন্তু দেশের জন্য তাঁর আত্মবলিদানের কথা বাঙালী তথা ভারতবাসীরা কি অস্বীকার করতে পারেন? মহান্ ব্যক্তির মহৎ কাজের প্রাপ্য মর্যাদা আপামর জনসাধারণ কতটুকু দিতে পেরেছে? এহেন জাতীয় ব্যক্তিত্বের জাতীয় সম্মান পাওয়া কি সমীচিন ছিল না? এই দুর্দমনীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন মহান্ নেতাকে অপপ্রচারের কালিমায় লিপ্ত করা কি কৌশল সর্বস্ব রাজনীতির স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষণ নয়? আশ্চ র্যের কথা যে এই অসাধারণ বাগ্মীতা ও স্বচ্ছ চিন্তাধারার অধিকারী শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতি পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে প্রায় ৩৯ বছর পর স্থান পেয়েছে। এ ঘটনায় জাতীয়তাবিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না কি? তাহলেও এই জাতীয়তাবাদী মহান্ নেতার অভাব পূরণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। জাতীয় স্বার্থে শ্যামাপ্রসাদের প্রদর্শিত পথকে বর্তমানে অনুসরণ করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। তাঁর মহান্ আদর্শকে গ্রহণ করাই বর্তমান প্রজন্মের কাছে মহান্ ব্রত হওয়া উচিত।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

হিন্দু ডাকে

হিন্দু বলে ওপারেতে
খাচ্ছ তুমি তাড়া
পালিয়ে এসেই সেকুলারে
হচ্ছ আত্মহারা।
আর কতদিন লুকোচুরি
খেলবে বাস্তুহারা
সেকুলার নয় হিন্দু ডাকে
এবার দাও সাড়া।

—ডঃ সুশীল কুমার সরকার, উত্তর ব্রহ্মপুর, কল্যাণী, নদীয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চৈতন্যস্মৃতিধন্য গঙ্গাপাড়ের মন্দির

ডঃ প্রণব রায়

গঙ্গাতীরের কাছে বা কিছু দূরে যে সব বেশির ভাগ মন্দির উনিশ শতকের দিকে তৈরি হয়, আমাদের দেখা তার কোনও কোনও মন্দিরের কথা উল্লেখ করছি। পরে দূরবর্তী গ্রামগ্রামান্তরের মন্দিরগুলির কথা উল্লেখ করব। তবে গঙ্গাতীরবর্তী যেসব

জয়মিত্রের কালীবাড়ি, কৃপাময়ীর নবরত্ন, বরাহনগর, কলকাতা।

মন্দির আমরা দেখেছি, তাদের প্রসঙ্গে বলা যায়, সেগুলির বেশির ভাগই 'আটচালা'-রীতির, খুব কমক্ষেত্রে 'রত্ন'-রীতির 'পঞ্চ ' বা 'নবরত্ন'। কোনও কোনও স্থানে 'দালান'-রীতির মন্দিরও দেখা গেছে।

বরাহনগর এলাকায় জয়মিত্র কালীবাড়ির কিছুটা দক্ষিণপুবে কুঠিঘাটের কাছাকাছি সিদ্ধে শ্বর কালীর 'দালান' মন্দির এমন কিছু দর্শনীয় না হলেও একটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। দালানটি দক্ষিণমুখী ও বেশ প্রশস্ত। সিদ্ধে শ্বরী কালী খুবই প্রসিদ্ধ। জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁরই কাছে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভারি অসুখের আরোগ্য কামনায় ডাব-চিনি মানত করেন। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকবার এসেছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী, জয়মিত্র প্রতিষ্ঠিত কৃপাময়ী, এই দেবী সিদ্ধে শ্বরী ও বরাহনগর বাজারের কাছে ব্রহ্মময়ী কালী খুবই প্রসিদ্ধ। সিদ্ধেশ্বরীর কিছুটা দূরে প্রসিদ্ধ বরাহনগর মঠ। এখানে একটা পুরানো বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদদের নিয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এরই অদূরে কাশীপুর বাগানবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নিকটবর্তী কাশীপুর শ্মশানঘাটে তাঁর মরদেহ ভস্মীভূত হয়। এইসব কারণে গঙ্গাতীরের কাছে এই অঞ্চ ল নানা কারণে প্রসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক হয়ে আছে।

বরাহনগরের আর একটি প্রসিদ্ধ স্থান হোল, চৈতন্যঘাটের কাছে সুপ্রসিদ্ধ 'শ্রীপাঠবাড়ি'। আজ থেকে প্রায় পাঁচ শ বছর আগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব পানিহাটি থেকে নৌকোয় করে এখানে আসেন। সময়টা ছিল জ্যৈষ্ঠমাস। মহাপ্রভুর স্মরণে প্রতিবছর ওই সময় হরিনাম-সংকীর্তনসহ তাঁর প্রতিকৃতি নৌকায় করে পানিহাটি থেকে চৈতন্যঘাটে আনা হয়। কাতারে কাতারে লোক সমবেত হন এবং বিরাট শোভাযাত্রা করে সংকীর্তন ও নৃত্যসহ তাঁর প্রতিকৃতি শ্রীপাঠবাড়িতে আনা হয়। এই স্থান অতিপ্রাচীন। পাঁচশ বছর আগে এখানে 'ভাগবতাচার্য' রঘুনাথ উপাধ্যায় বাস করতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর গৃহে পদার্পণ করে রঘুনাথ উপাধ্যায়ের ভাগবতপাঠ শ্রবণ করে অহোরাত্র হরিনাম সংকীর্তন সহ নৃত্য করেন। রঘুনাথকে মহাপ্রভু 'ভাগবতাচার্য' নামে অভিহিত করেন। পাঠবাড়ির সুপ্রশস্ত চত্বরে পুবমুখী 'দালান' মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, মাঝখানের ঘরে গৌরনিতাই বিগ্রহ এবং পরের কক্ষে রাধাকৃষ্ণ ও 'ভাগবতাচার্য' পূজিত রাধাকৃষ্ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে একটি ছোট্ট মন্দিরে মহাপ্রভুর ব্যবহৃত পাদুকার অংশ, 'ভাগবতাচার্যে'র শয়নকক্ষ, গৌরাঙ্গগ্রন্থ মন্দিরে রক্ষিত বহু প্রাচীন পুঁথি, শ্রীচৈতন্যদেব, প্রভু নিত্যানন্দ ও অন্যান্য সাধকদের হস্তাক্ষর, স্বহস্তলিখিত পুঁথি, পুরাতাত্ত্বিক বহু নিদর্শন প্রভৃতি রক্ষিত আছে।

দক্ষিণেশ্বরের পার্শ্ববর্তী আড়িয়াদহে 'দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘে'র উদ্যোগে শ্রীমৎ অন্নদাঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আদ্যামায়ের দক্ষিণমুখী সু-উচ্চ দেবালয়ে সকলের ওপরে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, তার ঠিক নিচে বালিকামূর্তি আদ্যাশক্তি কালীমাতা ও তার নিচে শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূলমন্দিরের পার্শ্ববর্তী দর্শকদের জন্য নাটমন্দির। এটি মূলমন্দির থেকে বিচ্ছিন্ন। এর পরেই সংলগ্ন বিস্তৃত মণ্ডপ। সেখানে দুর্গাপূজা ও বিভিন্ন ধর্মীয় ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। আদ্যা মায়ের মন্দিরের পেছনে একটি মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ছাড়াও একটি কক্ষে শ্রীমৎ অন্নদাঠাকুর ও তৎপত্নী যোগমায়া দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

আদ্যা মায়ের মন্দির নবনির্মিত ও একটি দর্শনীয় দেবালয়। কিন্তু দর্শকমণ্ডপ ও অনুষ্ঠান মণ্ডপের ছয়টি 'আটচালা' ও পশ্চি মে ছয়টি 'আটচালা' রীতির মন্দির বেশ প্রাচীন। মন্দিরগুলির গায়ে অবশ্য কোনও অলংকরণ নেই। পুব ও পশ্চি ম দিকের আটচালা সমূহের বেশির ভাগে শিবলিঙ্গ।

জয়মিত্র কালীবাড়ির দ্বাদশ শিবমন্দিরের একাংশ।

গৃহী শ্রীঅরবিন্দ

ডঃ সুখেন্দু কুমার বাউর

দোহারা চেহারার একজন শ্যামবর্ণ যুবক। অনেকের মধ্যে তিনি অনন্য। লণ্ডনে শিক্ষালাভ, তাই তখন বাঙালী হয়েও বাংলা সেভাবে বলতে শেখেননি। শিয়ালদহের সন্নিকটে বৈঠকখানা রোডের একটি দোতালা বাড়ী। সময় ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল, আজ থেকে ১০৯ বছর আগে। সেই যুবক সংবাদপত্রে নিজের বিয়ের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। এগিয়ে গিয়ে ঘটকালী করেন বঙ্গবাসী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু। বিখ্যাত শ্বশুরমশায় প্রথমযুগের বিলাত ফেরত রায়বাহাদুর ভূপালচন্দ্র বসু। তাঁর বাড়ী যশোর জেলায় কপোতাক্ষ নদ তীরের মেহেরপুর গ্রাম। মনে পড়ে কপোতাক্ষ নদের তীরে বাংলার অমরকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তেরও পিতৃভূমি। ভূপালচন্দ্র ঐতিহ্যের শিকড়কে ভালবাসতেন। আজীবন পৈতৃক বাসভূমি আপন ভাই ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। এ বিয়েও তিনি দিলেন হিন্দুমতে অগ্নি ও শালগ্রাম সাক্ষী করে। এই উদ্দেশ্যে তিনি গ্রামের বাড়ি যশোর থেকে কুল পুরোহিত যোগীন্দ্র ভট্টাচার্যকে বিয়ের আসরে পুরোহিত করে নিয়ে আসেন। বিয়ের বাসরে উপস্থিত লর্ড সিংহ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, গিরীশচন্দ্র স্বয়ং, প্রথিতযশা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ। কন্যার নাম— মৃণালিনী দেবী, ইনি ভবিষ্যজীবনে অসাধারণ পতিব্রতা ও ত্যাগী মহিলা। জাতীয় বিপ্লব আন্দোলনের অগ্নিপুরুষের সঙ্গে তাঁর গাঁটছড়া বাঁধা পড়ল ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল। উক্ত শ্যামবর্ণ যুবক আর কেউ নয়, বিপ্লব পুরুষ ঋষি অরবিন্দ। পরে অতিমানস যোগসাধনায় সোনালী গৌরবর্ণ হন। এই বিবাহ উপলক্ষে কন্যাপক্ষের আত্মীয়রা একটি কবিতা লিখে বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে বিলি করেন। যা ছিল তখনকার দিনের প্রথা। কবিতাটি মৃণালে অরবিন্দ (১৬ বৈশাখ, ১৩০৮)-র সামান্য অংশঃ

মরি মরি কিবা নিরাখি নয়নে
শোভে মৃণালিনী অরবিন্দ সনে
প্রফুল্লবয়ানে, পুলকিত মনে
আশীষ করিছে, সকলে মিলে।...
সত্যের আশ্রয় লইয়া উভয়ে,
থাকে যেন তব দাসদাসী হয়ে
সুখে কিবা দুখে উভয়ে মিলিয়ে
তোমারে যেন গো না ভুলে কখন।

মৃণালিনী দেবী শ্রীঅরবিন্দের যোগ্যা সহধর্মিনী। পরে শ্রীশ্রীসারদামায়ের মন্ত্রশিষ্যা হন। শ্রীঅরবিন্দ প্রাণায়াম অভ্যাস করতেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সময় স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর অসামান্য সেবার উল্লেখ করেছেন শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু। তিনি তখন সার্পেনটাইন লেন-এ শ্বশুর শ্রীভূপাল বসুর বাড়ীতে ছিলেন। আবেগভরা উৎকণ্ঠায় মৃণালিনী দেবী শ্রীঅরবিন্দের শিয়রে বসে মাথা টিপে দেন, কখনও পদসেবা করেন, কখনো পাখা নিয়ে হাওয়া করেন। নিজের হাতে পথ্য রান্না করে দেন। যেন মূর্তিমতী করুণা ও মমতা। শ্রীঅরবিন্দ সর্বদা লেখাপড়ায় নিবিষ্ট থাকতেন। কখন তিনি হাতমুখ ধোবেন, কখন চা জলখাবার খাবেন— তা ঘড়ির কাঁটা ধরে সরবরাহ করতেন মৃণালিনী দেবী। শ্রীঅরবিন্দ খেতে ভালবাসতেন ফুলকপি। সে সময় সস্তার দিন হলেও সবার সেরা তরিতরকারি ও মাছ মাংস আসত তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। শ্রীঅরবিন্দের জন্য আসত ৫-১০ সেরের রুই-এর মাথা, ফুলকপি, কড়াইশুটি, গাজর, বিট, ঘি, মাখন। মাছের মাথা ডুবন্ত তেলে ভেজে প্লেটে শ্রীঅরবিন্দকে দেওয়া হোত। মাছের মুড়ো ভেঙ্গে খেতে সাহায্য করতেন মৃণালিনী দেবী। শ্রীঅরবিন্দও নীরবে ধীরে ধীরে সবই খেয়ে নিতেন, অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতেন না।

মাঝে মাঝে চলত হাস্য পরিহাস আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে।

কর্মজীবনে সম্পাদনা করেছিলেন 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা। এর পেছনেও ছিল স্ত্রীর প্রেরণা। বড়ো আকারের বন্দেমাতরম প্রকাশিত হলো ১ নভেম্বর, ১৯০৬। ১৫০০ কপি ছাপা সব বিক্রী হয়ে যায়। একজন হকার চড়াদামে কপি বিক্রী করে তৎকালীন চার আনায়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিও বন্দেমাতরম-এর প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল। বিডন স্কোয়ারে বিরাট স্বদেশী সভা হয় লালা লাজপত রায় নেতৃত্বে। নব পার্টির নেতারা হলেন বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, খাপার্দে। কলকাতায় ২৩ ডিসেম্বর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন, খাপার্দে। বিডনস্কোয়ারের সভার বক্তা তিলক, খাপার্দে, বিপিন পাল প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ আসেন ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে 'বন্দেমাতরম' মামলায় মুক্তি পাবার পর। রবীন্দ্রনাথ দু' বাহু প্রসারিত করে শ্রীঅরবিন্দকে বুকে টেনে নেন। কবি রবির দুচোখ ছলছল করছিল। হেসে তিনি বলেন, 'কি মশায়, আমাকে ফাঁকি দিলেন'। শ্রীঅরবিন্দ ঈষৎ হেসে উত্তর দেন 'ত্বম্সব্ধ ন্দ্রম্সক্ত পুম্স্ংব্ধ'-বেশিদিনের জন্যে নয়। অনেকক্ষণ রবীন্দ্রনাথ গল্প করেন।

পরে কোনসময় রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরী যান, শ্রীঅরবিন্দকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন লেখেন— অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার। তাঁকে বলেন 'স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে একটি মজার ঘটনা ঘটে। চারুচন্দ্র দত্তের স্ত্রী লীলাবতী শ্রীঅরবিন্দ ও মৃণালিনী দেবীর জুটির জন্য দুগাছা বেলফুলের গড়ের মালা গেঁথে নিয়ে আসেন। বলেন, পরস্পর দুজন মালা গলায় পরাবেন এবং রাত্রে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন। শ্রী অরবিন্দ তাই করলেন ও মাঝ রাত্তিরে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে কাজের জন্য চলে এলেন।

নবাঙ্কুর

হারিয়ে যাচ্ছে ঝাড়ুদারেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কাক কিংবা শকুনের মতো সমাজ-বন্ধু এইসব 'ঝাড়ুদার-শ্রেণী'র প্রাণীরা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। পৃথিবী নোংরা হচ্ছে। বাড়ছে বিশ্ব-উষ্ণায়ন। এরা 'ঝাড়ুদার-শ্রেণী' কারণ ঝাড়ুদারের মতোই এদের ক্রিয়া কলাপ, নোংরা খাদ্যবস্তুর (এমনকী অখাদ্য হলেও) প্রতি এদের আকর্ষণ। আশ্চর্য বটে এদের লিভারের গুণ। যত অখাদ্যই খাক্, পেট খারাপ হবার জো-টি নেই।

একসময় এ দেশে শকুনের সংখ্যা ছিল চার কোটি। আজ কমতে কমতে তাদের সংখ্যা যাট হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এখনই সতর্ক না হলে আগামী ১০ বছরও যেতে হবে না, তার আগেই শকুনেরা চিরবিলুপ্ত হবে এখান থেকে। কথায় আছে, 'শকুনের লক্ষ্য ভাগাড়ের দিকে'। সৌন্দর্যায়নের স্বপ্ন দেখিয়ে ভাগাড় করা হয়েছে লোপাট, কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয়নি। তাই রাস্তায় জমছে ময়লা। ভাগাড়ের অভাবে শকুন মৃতপ্রায়, রাস্তায় জমা জঞ্জাল সাফাই করতে পারত কাক। কিন্তু মোবাইল টাওয়ারের দাপট, তাদেরকেও করেছে এন এইচ এসের তত্ত্বাবধানে এই কাক-শকুনদের বংশোৎপাদন করিয়ে সংরক্ষণের একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এই সংরক্ষণ কেন্দ্রটি গড়ে তুলতে খরচ পড়ছে ১ কোটি টাকা। বছরে ৭০ লক্ষ টাকা লাগবে তা চালানোর জন্য। প্রায় দেড়শো

বিপন্ন। আরও একটা ব্যাপার, বিজ্ঞানীরা বলছেন গত দেড় দশকে ভারতে রাস্তার কুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৫৫ লক্ষ। এদের আক্রমণে ১৯৯২ থেকে ২০০৬— এই ১৪ বছরে শকুনের সংখ্যা কমেছে ৯৭ শতাংশ। সুতরাং উপায়? বি শকুনের খাওয়ার জন্য প্রতি মাসে খরচা আড়াই লক্ষ টাকা। এঁটো-কাটা খেয়েই যাদের পূর্বপুরুষরা দিন-গুজরান করেছে, সেই উত্তরপুরুষ শকুনদের পেটে এত দামী খাদ্য সইবে তো? নাকি এঁটো-কাটারই দাম বেড়েছে অত?

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম।। ৫

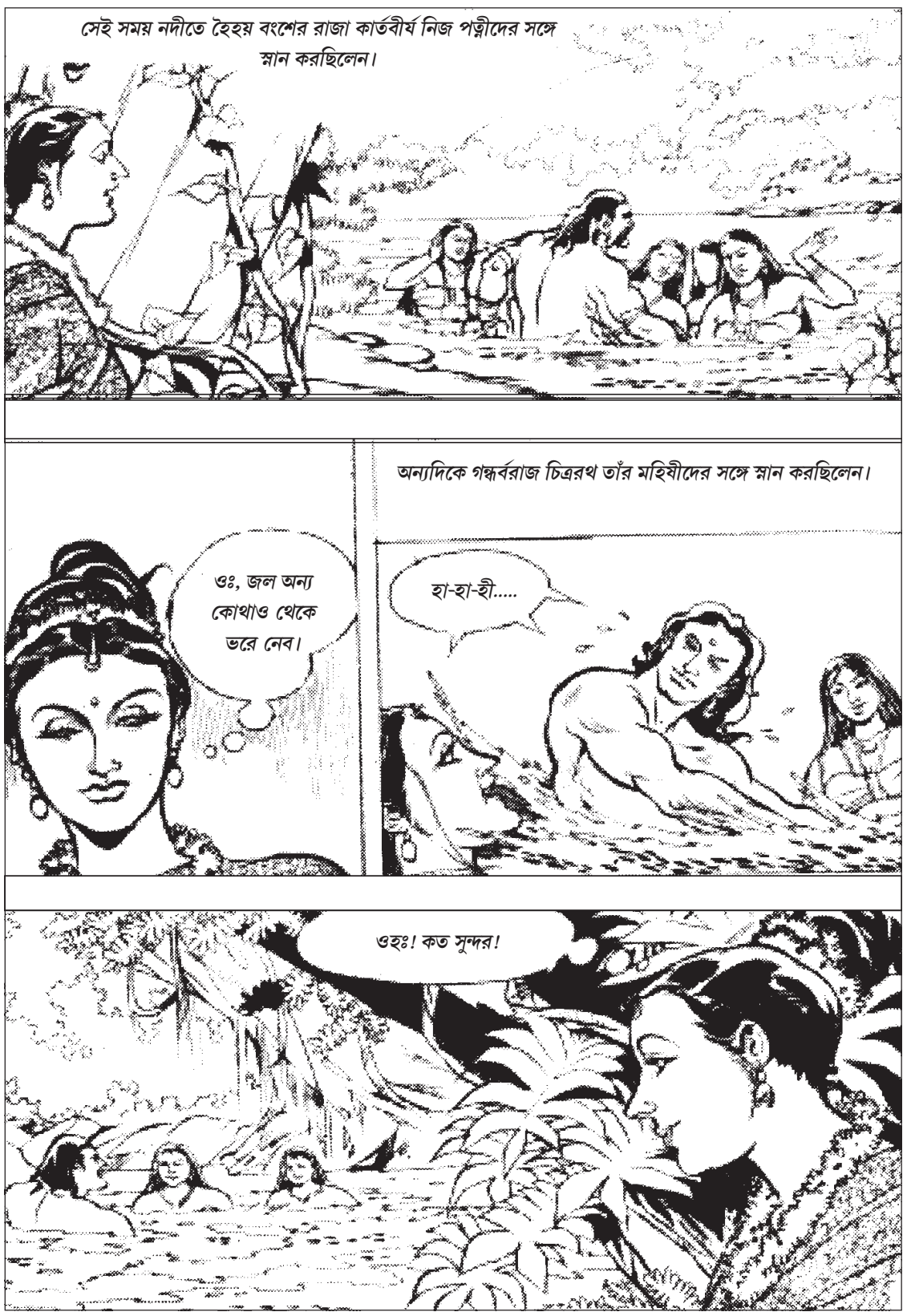

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর।।

মনোনীত হলে ছাপবেন

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যখন 'প্রবাসী'র সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তখন দেশজুড়ে নামডাক, বিশেষ করে নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্ববাসীর কাছে এক সুপরিচিত নাম। পত্র-পত্রিকার সম্পাদকেরা নিজেদের পত্রিকায় বিশ্বকবির লেখা ছাপাতে পারলে ধন্য মনে করতেন। ওই সময় এক গ্রীষ্মের দুপুরে কবি স্বয়ং 'প্রবাসী'র সম্পাদকের দপ্তরে হাজির; হাতে লেখার পাণ্ডুলিপি, যার পেছনে কবির স্বহস্তে লেখা, শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমার এই লেখাটি যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে 'প্রবাসী'তে ছাপাবেন। ইতি— ৮ নভেম্বর, ১৯২৯। আপনাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।... রামানন্দবাবু কবির লেখা দেখে হতবাক। এপ্রসঙ্গে তিনি পরে লিখেছেন, যাঁর লেখা পড়ার জন্য দেশের লোক উন্মুখ হয়ে থাকত, তাঁর সমস্ত পাণ্ডুলিপিতেই লেখা থাকত 'মনোনীত হলে ছাপবেন'।

ক্যান্সারের রোগীর (১০৫) নিউমোনিয়ায় মৃত্যু

দুরারোগ্য ক্যান্সার জীবাণু শরীরে নিয়েও ক্যালিফোর্নিয়ার লঙবীচ শহরের মিসেস উইনোনা মিলড্রেড মেলিক বেঁচে ছিলেন দীর্ঘ ১০৫ বছর। ক্যান্সারের কারণে তাঁর দেহে মোট চারবার অস্ত্রোপচার করা হয় ১৯১৮, ১৯৩৩, ১৯৬৬ ও ১৯৬৮ সালে। কিন্তু ১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর তিনি মারা যান সামান্য নিউমোনিয়া রোগে।

দেনার দায়ে দ্বীপ বিক্রি

বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কটে গ্রিসের হাল খুবই সঙ্গীণ। তাই ইওরোপের সম্পন্ন দেশগুলির সহযোগিতা চাইলে জার্মানির কিছু কর্তাব্যক্তি গ্রিসকে বেশ করে ধমকে দিয়ে বলেছেন, দেনার দায়ে লোকে সম্পত্তি বেচে দেয়। গ্রিসে তো জনমানবহীন দ্বীপ রয়েছে, তারই দু'চারটে বিক্রি করে দিলেই পারেন তাঁরা!

মোটরগাড়ির শুরুতে

মোটরগাড়ি রাস্তায় নামার শুরুর সময়ে ইংল্যান্ডে আইন করে ঠিক হয়, প্রতিটি গাড়ির জন্যে তিনজন বরাদ্দ থাকবে— দু'জন গাড়িতে, অন্যজন একটি লাল পতাকা নিয়ে গাড়ির সামনে হেঁটে বা দৌড়ে যাবে।

* বড়দের শরীরে ২০৬টি হাড় থাকলেও শিশুদের হাড়ের সংখ্যা ৩০০টি।

* আমাদের হাসতে লাগে ১৭টি পেশি আর ৪৩টি পেশির প্রয়োজন হয় ভুরু কোঁচকাতে।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

রমেন ঃ জানিস, কাল একটা চোর চাকু দেখিয়ে সব লুটে নিয়ে গেছে।

নরেন ঃ তোর তো বন্দুক আছে, মেরে দিলি না কেন!

রমেন ঃ সেটা লুকিয়ে রেখেছিলাম, নইলে ওটাও নিয়ে যেত।

* * *

মক্কেল ঃ আমি বউকে ডিভোর্স দিতে চাই।

উকিল ঃ কেন অভিযোগটা কী?

মক্কেল ঃ বউ আমার সঙ্গে কথাই বলে না।

উকিল ঃ আপনি তো ভাগ্যবান মশাই। অমন বউ তো লাখেও একটা জোটে না।

* * *

সরিৎ ঃ ওকি রে, ছুরিটা গরম জলে ফোটাচ্ছিস কেন?

সুজিৎ ঃ আমি আত্মহত্যা করব ওই ছুরি দিয়ে।

সরিৎ ঃ তার জন্যে ওটাকে গরম করার কী দরকার?

সুজিৎ ঃ যাতে ইনফেকশন না হয়!

* * *

গৃহকর্তা ঃ এই ভজা, কী দেশলাই এনেছিস, একটা কাঠিও তো জ্বলছে না!

চাকর ঃ কী যে বলেন কত্তা, আমি সবকটা কাঠি জ্বালিয়ে দেখে এনেছি।

* * *

সাংবাদিক ঃ আপনি বলেছেন, হাসপাতাল থেকে রোগী ফেরানো যাবে না। কিন্তু এত বড় দুর্ঘটনার রোগীদের যে হাসপাতাল ভর্তি করল না, তার জন্য সরকার কী ব্যবস্থা নেবে?

মুখ্যমন্ত্রী ঃ তদন্ত করা হবে।

সাংবাদিক ঃ রোগীর বিক্ষুব্ধ আত্মীয়রা যে ভাঙচুর করলেন সে বিষয়ে সরকার কী ভাবছেন?

মুখ্যমন্ত্রী ঃ তদন্ত করা হবে।

সাংবাদিক ঃ এই যে আপনারা এত তদন্ত কমিটি বসিয়ে চলেছেন, তাতে কি দায়িত্ব এড়ানো হচ্ছে না?

মুখ্যমন্ত্রী ঃ তারও তদন্ত হবে।

—নীলাদ্রি

ম গ জ চ র্চা

১। কোন্ দেশে প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা হয়?

২। ১৯৭০ সালের আগে বিশ্বকাপকে কী বলা হত?

৩। কোন্ দেশের ফুটবলারদের ব্লু সামুরাই বলা হয়?

৪। প্রথম কোন্ এশীয় দল বিশ্বকাপে কোয়ালিফাইং রাউন্ড খেলেছিল—যারা ১৯৩৪-এ মিশরের কাছে ৭—১ গোলে হারে?

৫। এবারের বিশ্বকাপ বিজয়ী দল আর্থিক মূল্যে কত ডলার পুরস্কার পেল?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। উরুগুয়ে

২। জুলে রিমে কাপ

৩। জাপান

৪। ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ

৫। ৩০ মিলিয়ন ডলার

সেবিকা সমিতির গ্রীষ্মকালীন বর্গ

সম্প্রতি গোটা পশ্চিমবঙ্গের মোট সাতটি স্থানে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির গ্রীষ্মকালীন বর্গ হয়ে গেল। উত্তর দিনাজপুরের বড়দাহী, দক্ষিণ চবিবশ

পরগণার বুড়ুল, দক্ষিণ দিনাজপুরের আদ্যখণ্ড, উত্তর দিনাজপুরের দরিমানপুর, উত্তর চবিবশ পরগণার হাসনাবাদ, পশ্চিম মেদিনীপুরের নছিপুর এবং গোবরডাঙ্গায় বর্গগুলির আয়োজন করা হয়েছিল। অঞ্চল ভিত্তিক বর্গের আয়োজন করায় স্থানীয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভাল সাড়া পাওয়া গেছে। কয়েকটি স্থানে পথসঞ্চলনের আয়োজনও হয়েছিল।

গত ৮ জুলাই নাগপুরের দেবী অহল্যা মন্দিরে অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী ও প্রতিনিধি মণ্ডলের অর্ধবার্ষিক বৈঠক হয়ে

গেল। উক্ত বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত সঞ্চালিকা মনোনীত হয়েছেন মুক্তিপ্রদা সরকার, প্রান্ত কার্যবাহিকা ঋতা চক্রবর্তী, সহ-কার্যবাহিকা মৌসুমী কর্মকার এবং পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ওড়িশার ক্ষেত্র কার্যবাহিকা হয়েছেন মহুয়া ধর।

মা নর্মদা সামাজিক কুম্ভ

পুণ্যভূমি ভারতের তপোভূমি নর্মদার তীরে আগামী নর্মদা জয়ন্তীতে (১০ ১১, ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১১) পূজ্য সন্তদের আহ্বানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মা নর্মদা সামাজিক কুম্ভ। সারা দেশ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ ভক্তবৃন্দের সমাগম হবে। পূজ্য মহামণ্ডলেশ্বর অখিলেশানন্দ গিরি মহারাজের মার্গদর্শনে গত ১৫, ১৬ ও ১৭ জুলাই মধ্যপ্রদেশের জববলপুর ও মাণ্ডলাতে ধর্ম জাগরণ সমন্বয় বিভাগের অখিল ভারতীয় বৈঠকে এই বিশাল কুম্ভের পরিকল্পনা ও যোজনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

আয়োজন সমিতির কার্যকরী সভাপতি নিরঞ্জন প্যাটেল (মাণ্ডলা) এবং সম্পাদক রাজেন্দ্র প্রসাদ এই বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রস্তুতির পূর্ণ বিবরণ রাখেন। ২০ লক্ষ লোকের আবাস ব্যবস্থা, ভোজন ব্যবস্থা এবং যাতায়াত ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। মা নর্মদাতে স্নানের জন্য ঘাট নির্মাণ (দুধারে) কার্যক্রমের রূপরেখা, সন্ত সম্মেলন, মাতৃ সম্মেলন এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জাতি-বিরাদরী প্রমুখদের সামনে "ন হিন্দু পতিতো ভবেৎ, হিন্দবঃ সোদরাঃ সর্বে" সম্মেলন হবে। ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে হিন্দুর জনসংখ্যা ক্রমশ ক্ষীয়মান হচ্ছে। সেইসঙ্গে প্রতি বছর 'লাভ জেহাদের' নামে হিন্দু মেয়েদের সমাজ থেকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্বামীজীর কথামতো এর ফলে একজন হিন্দুর সংখ্যাই কমে না শত্রুবৃদ্ধি হয়। মেয়েদের নিয়ে যাওয়া মানে একজন হিন্দুর সংখ্যাই কমল না উপরন্তু হিন্দুর বংশ- লতিকা শেষ করে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহযোগিতা। যার পরিণাম হবে আবার দেশ বিভাজন।

আগামী নভেম্বর মাসে এই বিশাল কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য প্রবন্ধকদের তিনদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। সারা দেশ থেকে ১০ হাজার প্রবন্ধক সেখানে প্রশিক্ষণ নেবেন।

হনুমতশক্তি

গত ৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শ্রীহনুমত শক্তি জাগরণ উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল কলকাতার এ সি মার্কেটের কাছে জৈন ভবনে। অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিল শ্রী হনুমত শক্তি জাগরণ সমিতি এবং সেখানে বক্তব্য রাখেন ধর্মেন্দ্রজী মহারাজ।

অযোধ্যায় রামমন্দির স্থাপনের দিন শ্রী হনুমত শক্তি জাগরণ সমিতির তরফ থেকে ১৬ আগস্ট সারা বিশ্বব্যাপী শ্রীহনুমত শক্তি জাগরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বলে সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৪ জুলাই ন্যাশনালিস্ট লইয়ার্স ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো। সভার উদ্বোধন করেন অধিবক্তা পরিষদের সর্বভারতীয় সহ সংগঠন সম্পাদক কমলেশ সিং। প্রসঙ্গত ফোরাম অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ শাখা। উদ্বোধনী ভাষণ দেন ন্যাশনালিস্ট লইয়ার্স ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও প্রবীণ আইনজীবী কালিদাস বসু। কমলেশ সিং তাঁর ভাষণে বলেন, এখন অধিবক্তা পরিষদকে আইনীযুদ্ধে লড়তে (লিগাল ব্যাটেল ফাইটিং) হচ্ছে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সঙেঘর ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, ধীরাজ ত্রিবেদী প্রমুখ। সমাপ্তি ভাষণ দেন সভাপতি অমিয় কুমার রায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কিঞ্জল বড়াল। সভায় প্রতিনিধি ছিলেন ৪০ জন।

রাজ্যপালকে ডেপুটেশন

মুসলমান অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদের নাম নিজের সরকারি প্যাডে মুসলিমাবাদ লিখে জেলা শাসক পারভেজ সিদ্দিকি সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে প্রশাসন পরিচালনা করছেন। তাই তাকে জেলা থেকে বিতাড়নের দাবি জানিয়ে গত ৫ আগস্ট বিজেপি-র রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যপাল এম কে নারায়ণনের হাতে তুলে দেওয়া হলো একটি ডেপুটেশন। ডেপুটেশনে সই করেন রাহুল সিনহা, তথাগত রায়, তপন সিকদার, অসীম ঘোষ, জে কে জৈথালিয়া প্রমুখ।

রফিসাহেব

অল ইন্ডিয়া মহম্মদ রফি সাহেব ফ্যানস গ্রুপের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে রফি সাহেবের অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে ভারত রত্ন প্রদান করুন সরকার। এছাড়াও তাঁর স্মরণে একটি উচ্চমানের জাতীয় কেন্দ্র (সঙ্গীত গ্রন্থাগার বা বিশ্ববিদ্যালয়) ও তাঁর নামে সঙ্গীতের ওপর জাতীয় পুরস্কারের দাবিও জানানো হয়েছে।

স্মরণসভা

গত ৩১ জুলাই তিন জন স্বয়ংসেবক তথা

বিজেপি নেতার প্রয়াণে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো মালদার টাউন হলে। প্রয়াত ওই তিন জননেতা হলেন অসীম চক্রবর্তী, বিনয় ভূষণ সরকার ও অজিত মৈত্র। এঁরা মানুষের কাছে এতটাই শ্রদ্ধেয় ছিলেন যে কালিয়াচকের সিপিএম বিধায়ক বিশ্বনাথ ঘোষ, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সম্পাদক জয়ন্ত বোস তাঁদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্পণ ও মাল্যদান করেন। অজিত মৈত্রের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী)-রও যোগাযোগ ছিল। প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ, আর এস এসের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার, প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্তমান জেলা সভাপতি শ্যামচাঁদ ঘোষ, বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, সন্তোষ শুকুল প্রমুখ স্মৃতিচারণ করেন।

মানব সম্পদ গঠনে সূর্য ফাউন্ডেশনের অনবদ্য প্রয়াস

সূর্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবছর এপ্রিল, মে এবং জুন অর্থাৎ তিন মাস ধরে সম্পন্ন হলো দেশের কুড়িটি রাজ্য থেকে আসা প্রায় পঞ্চাশ হাজার তরুণ কিশোরদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ বর্গ। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর ধরেই সূর্য ফাউন্ডেশন দেশের বিভিন্ন

রাজ্য থেকে সমস্ত ধরনের তরুণ কিশোরদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালিয়ে আসছে। এরজন্য দিল্লির উপকণ্ঠে ঝিন্‌ঝোলি নামক স্থানে কয়েক একর জমির উপর একটি অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও গড়ে তোলা হয়েছে। যেখানে ফুটবল খেলা থেকে সাঁতার সহ বিভিন্ন ধরনের শারীরিক দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আধুনিক ব্যবস্থাপনা (Modern Management) শিক্ষায়তনের পরিসর নির্মাণ করা হয়েছে।

সূর্য ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শ্রী জয়প্রকাশ আগরওয়ালের বক্তব্য অনুযায়ী, বালক কিশোরদের অল্প বয়সেই শিক্ষা গ্রহণের একটা সহজাত প্রবণতা থাকে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির দিকে সূর্য ফাউন্ডেশন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলা, সঙ্গীতচর্চা, ব্যায়াম ছাড়া সমষ্টিগতভাবে ফুটবল, ভলিবল, খো খো, কবাডি ইত্যাদির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য ছোট ছোট কাহিনীর মাধ্যমে শিক্ষাও দেওয়া হয়। এসবের মধ্য থেকেই উদ্যম, অনুশাসন বোধ, দেশভক্তির জাগরণ ঘটিয়ে দৃঢ় চরিত্রের তৈরি করার প্রয়াস চলছে বলে শ্রী আগরওয়াল মন্তব্য করেন। দেশ তথা সমাজ গঠনে এই উদ্যোগ সহায়ক হবে বলে তিনি দাবি করেন। এমনকী আপাতকালীন বিপর্যয়ের মোকাবিলায় এই প্রশিক্ষণ কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি জানান।

খেলার জগৎ

হকি ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

দুষ্টচক্রই পারগতকে হারিয়ে দিল

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। শেষ পর্যন্ত ৮০ বছরের ঠাকুরমার ওপরই ভারতীয় হকির দায়ভার সপেঁ দেওয়া হলো। বিদ্যা স্টোকস, সোনিয়া গান্ধীর স্নেহধন্য এই কংগ্রেস নেত্রী ১৯৮৪ থেকে অদ্যাবধি মহিলাদের জাতীয় হকি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। অবদান 'বিগ জিরো'। এবার হকি ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিশ্বখ্যাত ডিফেন্ডার পারগত সিংকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে দেন। মেয়েদের মতো পুরুষদের হকিকেও রসাতলে পাঠাতে একটু বেশিই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবেন হিমাচল প্রদেশের এই কংগ্রেস নেত্রী!

আসলে দু'বছর আগে সুরেশ কালমাদি এবং আই ও এ কেপিএস গিলের স্বেচ্ছাচারিতা দূর করতে ভারতীয় হকি ফেডারেশন ভেঙে দেন। গঠিত হয় হকি ইন্ডিয়া, তা-ও অচিরেই এফ আই এইচ বা অন্তর্জাতিক হকি সংস্থার অনুমোদন পেয়ে যায়। গিলের অপশাসনের অবসান ঘটাতে গিয়ে আর একটা অপশাসন কায়েম করা হলো ভারতীয় হকি প্রশাসনে। গিল জমানায় ভারত এশিয়ান গেমস থেকে ব্রোঞ্জ পদকটিও খুইয়ে দেশে ফিরেছে। অলিম্পিয়াডে মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা থেকে বঞ্চি ত হয়েছে। এরকম অজস্র লজ্জাজনক কীর্তির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে নয় বারের অলিম্পিক সোনা জয়ী দেশের নাম।

আর হকি ইন্ডিয়া গঠিত হবার পর নিজের দেশে বিশ্বকাপে অষ্টম স্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এশিয়া কাপের খেতাব জমা রেখে আসতে হয় দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে। খেলোয়াড়দের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, দলীয় সংহতি একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকে। অর্থাৎ যাহাই আই এইচ এফ তাহাই পরিবর্তিত হয়ে হকি ইন্ডিয়া। সেই মাৎস্যন্যায় সমানে চলছে। রাজা বদল হয়, রাজ্যপাট একই থেকে যায়। এই অবস্থা সর্বাত্মক সংস্কার করতেই প্রাক্তন জাতীয় অধিনায়ক পারগত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু সুরেশ

পারগত সিং

কালমাদির পেশী ও অর্থ শক্তির সঙ্গে তার ক্রীড়াদ্যুতি ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা এঁটে উঠতে পারল না।

পারগত নিজে যেমন মাথা উঁচু করে খেলেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন ভারতকে, তেমন করেই স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রশাসন ও সংগঠন চালাতেন। কিন্তু তাঁর যাবতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতাকে গলা টিপে হত্যা করা হলো। রাজনীতির অশুভ শক্তি ও স্বার্থান্বেষী কায়েমী চক্র তাকে অন্যায়ভাবে হারিয়ে দিল। এরা যে নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত। আর তাদের যাবতীয় দুর্নীতি দেখেও চোখ বুজে রয়েছে আই ও এ এবং কেন্দ্রীয় সরকার। যেহেতু হকি ইন্ডিয়া প্রশাসনে যারা আছে তারা সবাই সুরেশ কালমাদি ও সোনিয়া গান্ধীর কাছের লোক।

এই অশুভ আঁতাত ভেঙে ভারতীয় হকির খোলনলচে পাল্টে এক নতুন দিশা দেখাতে চেয়েছিলেন পারগত। তাঁর আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়ী জীবনের দীর্ঘ-অভিজ্ঞতা এবং পাঞ্জাব ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের উচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের দক্ষতার মিশেলে সত্যিকারের প্রশাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটতো পারগতের। লাভবান হোত ভারতীয় হকি। তার পিছনে ছিল দেশের বহু প্রাক্তন ও বর্তমান হকি তারকারা। কিন্তু তাদের ঐকান্তিক উদ্যোগ ও স্বপ্ন তথা আশা-আকাঙ্ক্ষার যে এভাবে সলিল সমাধি ঘটবে, তা বোধহয় বিদ্যা স্টোকসের অতিবড় ভক্তও ভাবতে পারেননি।

তবে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ও মন্ত্রী এম এস গিল সব দেখেশুনে নড়েচড়ে বসেছেন। মন্ত্রী হকি ইন্ডিয়ার নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে আই এইচ এফকে ফিরিয়ে আনার একটা সুপ্ত ইচ্ছে পোষণ করেছেন গিল। কিন্তু আই এইচ এফ স্বয়ংশাসিত ক্রীড়া সংস্থায় সরকারের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না। তারা হকি ইন্ডিয়াকেই অনুমোদন দিয়েছে। এখন লড়াই জমে উঠবে এদেশের ক্রীড়ামন্ত্রকের সঙ্গে আন্তর্জাতিক হকি সংস্থার।

ষড়যন্ত্রে সোনিয়া কংগ্রেস

(৯ পাতার পর)

২০০৮-এ ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, সিমি-র মতো দেশজ জঙ্গি সংগঠনগুলি পাকিস্তানের আই এস আই, লস্কর-এ-তৈবার সক্রিয় মদতে দেশের বিভিন্ন স্থানে হত্যালীলা চালিয়ে দেশের বিরুদ্ধে যখন অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত, কেন্দ্রের সোনিয়ার কংগ্রেসী সরকার হতবাক এদের উৎস সন্ধানে ব্যর্থতায়, তখন গুজরাতে গত এক দশকে ২৫০ জন সন্ত্রাসবাদীকে শাস্তি দিতে সফল হয়েছে বানজারার পুলিশই। এমনকী সন্ত্রাসবাদীরা যখন উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, জয়পুরের মতো স্থানগুলিতে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তখন এই গুজরাট পুলিশ-ই মাত্র ২০দিনে (যা একটা রেকর্ড) আমেদাবাদ হামলায় কেসটির সূত্র খুঁজে বের করে এবং দিল্লি পুলিশকে গোপন সংবাদ জানিয়ে আরও সন্ত্রাসবাদী হামলাকে নিষ্ক্রিয় করতে সাহায্য করে।

সোহ্‌রাবউদ্দিন মামলায় আরেক পুলিশ অফিসারের নাম বহুচর্চিত তিনি হলেন অভয় চৌদাসমা। এই অফিসারটি কীভাবে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করেছেন তারই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে তুলে ধরা হলো।

১। ২০০ সালের ২৬ জুলাই আমেদাবাদে যে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটায় সিমি ও ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের মতো সংগঠনগুলি, তখন এদের দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন চৌদাসমা। ৬৪ জন জঙ্গি গ্রেপ্তার হয় এবং গুজরাট পুলিশের প্রেরিত তথ্যে তৎপর হয় অন্যান্য রাজ্যের পুলিশ বাহিনী এবং এড়ানো গেছে প্রাণহানি।

২। চৌদাসমা নেতৃত্বাধীন বাহিনী ৩৪ জন মারাত্মক অপরাধীদের (যাদের জঙ্গি কার্যকলাপও সুবিদিত) গ্রেপ্তার করে রাধিকা জিমখানায় ৯ জন মানুষের হত্যা মামলায়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় বহু অস্ত্র।

৩। ২০ জন মারাত্মক অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে চৌদাসমা বাহিনী যখন আবদুল লতিফ ও তার সাকরেদদের ধরতে গিয়ে আক্রান্ত হয়।

৪। গুজরাট পুলিশ বাহিনী ৫ জন সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেপ্তার করে যাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে আড়াই কেজি আর ডি এক্স, ২ কেজি ইয়োলো আর ডি এক্স এবং ৪টি টাইমার সহ ডিটোনেটর। এই ভাবে বোমা বিস্ফোরণের অপচেষ্টা করছিল।

বানজারা, চৌদাসমা, ড. এন কে আমিন-এর মতো নিষ্ঠাবান পুলিশ অফিসাররা গুজরাটে শুধু বহু সন্ত্রাসবাদী হামলা প্রতিহতই করেননি, সময় মতো সতর্কবার্তা পাঠিয়ে বাঁচিয়েছে বহু প্রাণ ও সম্পত্তিহানি। অথচ সোনিয়ার সি বি আই বাহিনী মিথ্যা মামলায় এঁদের জড়িয়ে জেলের ঘানি টানাচ্ছে গত তিন বছর ধরে। অমিত শাহ এঁদেরই তালিকায় এক নতুন সংযোজন। নিষ্ঠাবান পুলিশ আধিকারিকদের এমন কলঙ্কলেপন এবং সোহ্‌রাবউদ্দিনের মতো কুখ্যাত অপরাধীদের সমর্থনে এগিয়ে আসার ব্যাপারে সোনিয়া কংগ্রেসের এমন অপপ্রয়াস কার্যত নৈতিক চরিত্রবান প্রশাসনিক অফিসারদের মনোবলকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। এইসব কারণেই এবং রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন মদতে পুলিশের একাংশ দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছে। আগামীদিনে বাহিনীর মনোবলকে এমনভাবে আঘাত করলে পুলিশের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেবে। যেভাবে পুলিশ আধিকারিকদের হেনস্থা চলছে তাতে বিভিন্ন রাজ্যে গোপন তথ্যের বিনিময়ে অতীতে যে জঙ্গি তৎপরতা এড়ানো গেছে, ভবিষ্যতে তা হয়ত আর এড়ানো যাবে না।

শব্দরূপ - ৫৫৮

শ্রেষ্ঠা রায়

■	■	১	২			৩	■
■	■	■		■	■		■
৪	৫	■	৬		৭		
■	৮	৯		■		■	■
■	■		■	১০		১১	■
১২	১৩				■	১৪	
■		■	■		■	■	■
■	১৫					■	■

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. প্রথম তিনে পদ্ম, শেষ দুয়ে বল্লরি আসলে উত্তম-সুচিত্রার এক বিখ্যাত ছবি, ৪. রামচন্দ্রের পিতামহ, ৬. স্বদেশভক্ত, স্বদেশের সেবক, ৮. দেবরাজ ইন্দ্র, শেষ দুয়ে তামাম, ১০. মেঘজাত শিলা, প্রথম দুয়ে খাজনা, ১২. যমালয় বা মৃত্যুপুরী, ১৪. তিল বা নারিকেলের নাড়ু, ১৫. বঙ্গীয় শব্দে বোর্ড, আগাগোড়া বয়েস, শেষ দুয়ে ইঙ্গ তালা।

উপর-নীচ ঃ ২. শিব, ৩. শেষ বা সমাপ্তি, শেষ দুয়ে মামার বউ, ৫. সুপরিচিত লাল রঙের গন্ধহীন পুষ্পবিশেষ, ৭. ইঈ শব্দে চাপ, ৯. পৌরাণিক সূর্যবংশীয় রাজা বিশেষ ইহার বংশধর ভগীরথ মর্তে গঙ্গা আনয়ন করেন, ১০. প্রতিশব্দে ধনশালী, পয়সাওয়ালা, ১১. কৃষ্ণবর্ণ তাই শ্রীকৃষ্ণের অন্যনাম, ১৩. স্বর্গের অপ্সরা বিশেষ।

সমাধান শব্দরূপ ৫৫৬

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।
নীলিমা রায়
নলহাটি, বীরভূম।

প	দ্মা	ক্ষ	■	বা	ল	শ	শী
ম্পা	■	পা	তা	ম	■	■	■
■	বৃ	ন্ত	■	ন	ন্দ	ন	জ
■	ন্দা	■	■	■	■	র	■
■	ব	■	■	■	■	ব	■
ম	ন	সি	জ	■	ক	লি	■
■	■	■	ল	খা	ই	■	উ
মে	ঘ	না	দ	■	লা	লি	মা

সমাধান শব্দরূপ - ৫৫৭

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।

■	■	ক	ম	ল	আঁ	খি	■
■	■	■	হা	■	■	লা	■
পৃ	থা	■	কা	র	বা	ই	ড
■	ন	কু	ল	■	দ	■	■
■	■	টি	■	ব	লা	ই	■
ক	ম	লা	স	ন	■	লা	ক্ষা
■	ধু	■	■	ধা	■	■	■
■	ক	ল্কি	পু	রা	ণ	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৫৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১০ সংখ্যায়।

নৈরাজ্যের শক্তি দিয়ে শাসক হওয়া যায় না

গ্রাম পুড়ছে, বাড়িঘর জ্বলছে, লাঠি-গুলি-ধর্ষণে বাংলা রক্তাক্ত হচ্ছে, মানুষ মরছে, বন্দী এবং নিখোঁজ হচ্ছে আরও বেশী। এই চালচিত্রেই নতুন প্রজন্মের মেয়র শোভন। উত্তরবঙ্গের আন্দোলনের স্বীকৃতিতে এ্যাডভোকেট ফরজানা আলম ডেপুটি মেয়র। মাথার ওপরে সুব্রতর নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ কমিটি। কাজের গতির লক্ষ্যে সর্বত্র তারুণ্যের প্রাধান্য। মানুষের অসহায়তা থেকে জেগে উঠেছিল যে অবিশ্বাস, যে অবিশ্বাস জমাট করেছিল প্রতিবাদকে, যে প্রতিবাদ থেকে মানুষ ভেবেছে তারা প্রতারিত হচ্ছে, প্রবঞ্চিত হচ্ছে— মানুষের সেই ভাবনাই জন্ম দিয়েছিল পরিবর্তনের। পরিবর্তন হলো সেই শব্দবন্ধ যা শব্দশস্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু পরিবর্তনের সেই শব্দশস্ত্র মানুষের অপহৃত লুণ্ঠিত চেতনাকে ফিরিয়ে আনছে কই? মাটিতে কোথায় শস্যবীজ জাগছে, অঙ্কুরের উদ্গম আকাশের আলোকে হাতছানি দিচ্ছে কোথায়?... আকাশের সর্বকোণে পরিবর্তনের মেঘ জমছে, রাজ্যের সর্বত্র সময় বদলের ঝড় উঠছে। সময়ের নির্বাচিত গন্তব্যের নাম এখন মমতা—মমতা এখন নদীনালা নন, তিনি এখন সাগর। ইতিহাসের নালা-নর্দমা বেয়ে কত নদী দিয়ে বেনোজল ঘোলাজল সব জল এখন সেই সাগরে পড়ছে। সাগরের স্বচ্ছজলে মেঘলা আকাশের গাঢ়তম ছায়া ধীরে নামছে, শাসকশ্রেণীর মল-মূত্র রহস্যময় দ্রুততায় ঘূর্ণীবাতাসের তরঙ্গময় ধারায় ধারায় মানুষের শান্তিকে ভাঙছে। 'তৃণমূল' নাম নিয়ে দিকে দিকে চলেছে তৃণমূলকেই খতম করার চেষ্টা। একশ্রেণীর তৃণমূলকর্মী যেন রাতারাতি আখের গুছিয়ে নিতে চলেছেন। গ্রামে-গঞ্জে কোথাও কোথাও চলেছে তৃণমূলের নামে অপ্রয়োজনীয় কিন্তু অভাবনীয় তোলাবাজি। অন্যদলের দলছুট অনুপ্রবিষ্ট লুম্পেন প্রলেতারিয়েতদের নিয়ে কোথাও কোথাও চলেছে অবিশ্বাস্য খুন-জখম-অস্ত্র মজুত এবং মারদাঙ্গার ধারাবাহিক ঘটনাক্রম। নানান অবিচার-অনাচার দুর্নীতি সমাজে-প্রতিষ্ঠানে আছেই, কিন্তু তাই নিয়ে হাসপাতালে সরকারি অফিসে-আদালতে হামলা এবং বেপরোয়া ভাঙচুর তৃণমূলের কর্মকাণ্ডে নতুন করে সংযোজিত হচ্ছে। শাসকশ্রেণীর লোকেরাই সুযোগ পাচ্ছে বলে হাজার হাজার চাকুরিপ্রার্থীর পরীক্ষাকে ভণ্ডুল করে দেওয়া হচ্ছে। দুর্নীতির তদন্তের স্বার্থেই নাকি আসন্ন বর্ষার মুখে খোদ কলকাতা মহানগরীরই নিকাশী ব্যবস্থাকে বন্ধ রাখা হচ্ছে। শাসক সি পি আই (এম)-এর কুৎসিত এবং কদর্যরূপ তৃণমূলের শরীরেও কোথাও কোথাও নতুন অবয়ব গ্রহণ করছে। দুর্নীতি-দুরাচার-কর্তৃত্ববাদী আচরণ তৃণমূলের পরিচালিত পৌরবোর্ড এবং পঞ্চায়েতগুলিরও কোথাও কোথাও দানা বাঁধতে শুরু করেছে বলে খবর আসছে।

বিশাখা বিশ্বাস

নবাগত তৃণমূল-কর্মীদের কারো কারো অসংযত জিহ্বার অরুচিকর উচ্চারণে বিরক্তি ও বিবমিষা জন্ম নিচ্ছে পরিবর্তন-পন্থী মানুষের কারো কারো অন্তরে। মায়ের পেটে সি পি আই (এম)-এর পোষা যে হার্মাদেরা

লাথি মেরেছিল, আজ তৃণমূলের প্রতিবাদ-মিছিলে সেই হার্মাদদেরই দেখে মায়ের হাতে চাপ দিয়ে ছোট্ট তৃণমূল শিশুটিই সভয়ে বলছে: মা, ওই দ্যাখো!...

মানুষ এই সব দেখছে। গণতান্ত্রিকতার যে ক্রম-বিনাশ বিগত তেত্রিশ বছরে সমাজে-অফিসে সর্বত্র সৃষ্টি করেছে সর্বগ্রাসী এক উন্মত্ততার, বেপরোয়া দুর্নীতি ও দম্ভের, বেহায়া হিস্টিরিয়ার— মানুষ সে-সবও দেখেছে। মানুষ দেখেছে সততা, জনপ্রিয়তা, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, দুর্মর অধ্যাবসায় এবং সি পি আই এম-বিরোধিতায় মমতার সমীহ এবং সম্ভ্রম অর্জনের ইতিহাস। রেশন কেলেংকারি, বৈদিক ভিলেজ কাণ্ড, প্রমোটার রাজনীতি, সিটিটিআই আন্দোলন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমির আন্দোলন, বস্তি এবং হকার উচ্ছেদ ইত্যাদি সংগ্রামী সংগঠিত আন্দোলনগুলি একদিকে যেমন ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে মার্ক্সবাদের যান্ত্রিকতাবাদী, মননশক্তিবিহীন সুবিশাল এক ক্যাডার বাহিনীকে, অন্যদিকে মমতার উত্তরণ ঘটিয়েছে নেহাৎ লড়াকু মেয়ে থেকে দায়িত্বশীল এক নেত্রীত্বে। মমতার যেমন শক্তি বেড়েছে, সেই শক্তিকে সর্বদা এবং সর্বত্রই তার বর্ধিত দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত রাখার পরিমণ্ডলও গড়ে উঠেছে। তার প্রতিটি শব্দে তাই উদ্ধৃত উচ্চারণ— সে উচ্চারণ স্বচ্ছ অথচ তির্যক, রূপময় কিন্তু অনন্যমনস্ক। ক্ষমতার স্টাইল অব্ পলিটিক্স এবং মমতার রাজনীতির এইখানেই বিষমতা। সেই বিষমতার সুযোগ চিরকেলে কৌশলী পার্টি সি পি আই (এম) নেবেই এবং নিচ্ছেও।...

মমতাকে বুঝতে হবে, পরিবর্তনপন্থী তার দলে জাতীয় ঐতিহ্যবিস্মৃত, জাতীয় চরিত্রবিচ্যুত, ভ্রষ্ট নৈতিকতা এবং বিপন্ন আদর্শের সংখ্যালঘু কর্মীরা কাজ না করেও দলানুগত্য দেখাতে পারে, আইন না মেনেও মানুষকে অবজ্ঞা করতে পারে, নেত্রীর নেক-নজরে থাকা কর্মীরাও ইচ্ছেমতো হামলা-অবরোধ করে পার পেয়ে যেতে পারে। ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও, আগুন লাগাও এসব লালবাদীদের চরিত্র হলেও এইসব নৈরাজ্যের শক্তি দিয়ে শোষক হওয়া যায়, সুযোগ্য শাসক হওয়া যায় না। তা যদি যেত, তবে বামবাদী শাসনব্যবস্থার এমন মৃত্যুদশা হোত না। মমতাকে বুঝতেই হবে, আদর্শের পার্টিকে শিখের তুলে দিয়ে ক্ষমতার মধুভাণ্ডকে তার যে কর্মীমণ্ডল মোক্ষ বলে ভাবতে শুরু করেছে, পার্টিতন্ত্রকে যারা ক্ষমতার উর্বরক্ষেত্র বলে মনে করতে চলেছে, তারাও সি পি আই এম-বর্বরদের মতো একদিন আবার উচ্চারণ করতে পারে: লে আও, উসকো শির লে আও, উসকো ঘরমে থান কাপড়া পাঠাও।... মমতার রাজনৈতিক শক্তি যে মমতার চেয়েও অনেক বড় সেকথা ভবিষ্যতের বদলে বর্তমানেই বুঝতে হবে মমতাকে। পরিবর্তনের ঝড় অনেক বড়, কিন্তু বিস্ময়ের ঝড় যে আরও বড় তাও বুঝতে হবে। পরিবর্তনের সেই নতুন অর্থবহ রূপটাকে নবারুণ আকাশের কামনায় তাই উন্নীত করতে হবে তাঁকেই। কেননা বাংলার উৎপীড়িত মানুষ প্রতিবাদী, প্রতিরোধী এবং পরিবর্তনপন্থী মানসিকতার কল্পপ্রতিমায় উন্নীত করেছে যে তাকেই!

জলাজমি ভরাট করে বেআইনী বাড়ি নির্মাণ রমরমিয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা।। কথায় বলে 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়।' কিন্তু আজকের আধুনিক প্রেক্ষাপটে যদি এই প্রচলিত বাক্যটি পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে দাঁড়ায় ''যেখানে প্রমোটারের ভয়, সেখানেই জলাজমি ক্ষয়,'' তাহলে বোধহয় খুব ভুল হবে না। কলকাতার পূর্বদিকে ই এম বাইপাস। সেদিকে তাকালেই নজরে পড়বে সারি সারি বহুতল ফ্ল্যাট। ঝাঁ চকচকে শপিং

রাতারাতি ভরাট হচ্ছে জলাজমি। সৌজন্যে প্রোমোটার।

মল। মাল্টিপ্লেক্সও চোখে পড়তে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অধিকাংশ বহুতল ফ্ল্যাটবাড়িগুলো গজিয়ে উঠেছে জলাজমির উপর। রাজনীতিবিদদের মগজাস্ত্র ও প্রমোটারদের গা-জোয়ারির সার্থক মিশ্রণ এই ফ্ল্যাট বাড়িগুলো। যে জলাজমিগুলোর দৌলতে রাজ্যসরকারের কোটি কোটি টাকা মুনাফা হতে পারত, সেগুলোই আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে প্রমোটারদের কোপে। অথচ এই পুরো প্রক্রিয়াটাই চলে বেআইনি ভাবে। পরিবেশ ও উন্নয়ন দপ্তরের কর্মী এ কে ঘোষ এই বিষয়ে বলেন, ''প্রতিনিয়ত শহরের জলাজমিগুলো ভরাট করার ফলে মৎস্য উৎপাদন ও কৃষিকার্যে ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। বর্তমানে ই এম বাইপাস সংলগ্ন এলাকা বহু লোকের বাসস্থানে পরিণত হয়েছে। আর বেআইনিভাবে ফ্ল্যাট বাড়ি গজিয়ে ওঠার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রচুর জলাজমি। পরিবর্তিত হয়েছে বাস্তুসংস্থানও। এছাড়া চৌবাগা ও নন্দনডাঙা মৌজা তো রয়েছে বাসন্তি ও চাক খোলার খালের মাঝখানে।''

সম্প্রতি সল্টলেকের তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রের বিকাশের জন্য ৭৮৪ কাটা জলা জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয় সরকারের পক্ষে। রাজ্য সরকারের তরফে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নির্মাণের প্রস্তাবও দেওয়া হয়। সরকারের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে এগিয়ে আসে বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বেসরকারি সংগঠন 'পাবলিকে'র তরফে বনি কক্কর সরকারের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আদালতে পি আই এল দাখিল করেন। এই ঘটনার জেরে, পরবর্তীসময়ে বিচারপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি নিজে সরকারের প্রস্তাবিত জমিগুলো পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি সব দেখেশুনে সরকারের প্রস্তাব খারিজ করে দেন ও জলা জমিগুলো সংরক্ষণ করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেন। ১৯৯৩ সালে, হাইকোর্ট জলাজমি ভরাটকে বেআইনি ঘোষণা করে তাকে সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেয়। হাইকোর্ট জানায়, জলাজমির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে তার উপর নির্মাণকার্য বন্ধ রাখতে হবে।

রাজ্যের প্রস্তাবিত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার প্রকল্পের বিরুদ্ধেও রায় দেয় হাইকোর্ট। বিশ্বের বৃহত্তম সম্পদ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত রামসার সাইটের মত অনুযায়ী ''জলাজমি আমাদের গ্রহকে সজীব এবং ভাল রাখতে সাহায্যে করে। অসংখ্য প্রাণী, উদ্ভিদ, কীট- পতঙ্গ বেঁচে থাকার জন্য জলাজমির উপর নির্ভরশীল। বিশ্বের ৫ শতাংশ কার্বন গ্যাসের উৎপত্তিও হয় জলাজমি থেকে।''

জলাজমির প্রতিনিয়ত ক্ষয় রুখতে ২০০৬ সালে গঠিত হয় ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরীটি (ই সি ডব্লু এম এ)। ১৯ জন সদস্য নিয়ে তৈরি এই অথরীটির মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব কলকাতার জলাজমিগুলোকে সীমানা দিয়ে ঘিরে দেওয়া। প্রমোটারদের কবল থেকে জলাজমিকে রক্ষা করাই ছিল এই অথরীটির মূল লক্ষ্য। কিন্তু ই সি ডব্লু এম এ'র কড়া পদক্ষেপ সত্ত্বেও চলতে থাকে জলাজমি ভরাট অভিযান। গড়ে উঠে ই-এম বাইপাসের মতো ঝাঁ চকচকে শহরাঞ্চল।

স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, বর্তমানে চৌবাগার ১৮ বিঘা জমিতে অবস্থিত লেক বা বিল বর্তমানে প্রমোটারদের দৌলতে জলা-জমিতে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বহু ওজোর-আপত্তিও কার্যকর হয়নি। সম্প্রতি প্রমোটারদের হাতে পড়ে ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হতে চলেছে বাইপাসেরই আরেকটি জলাজমি। স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্মতি ছাড়াই ৩০ বিঘা এই জমিটি আজ ধ্বংসের মুখে। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, এই সমস্ত জলাজমিই বর্তমানে রামসার সাইটের আয়ত্তের মধ্যে পড়ে। প্রমোটারদের এই কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন পরিবেশবিদ্ সুভাষ দত্ত। তিনি বলেন, ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ডে'র (রামসার সাইট) অধীনে তালিকাভুক্ত জলাজমি ভরাট করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। প্রমোটারদের এমন কার্যকলাপ বহুদিন ধরে চলে আসছে। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই এইরকম দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।'' একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বহু জলাজমি আছে, যার উপর নির্ভর করে চলে অজস্র মানুষের জীবিকা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছু স্বার্থলোভী মানুষ কোটি কোটি টাকার মুনাফার লোভে সেইসব জলাজমি গুলিকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

ই সি ডব্লু এম-এর চিফ টেকনিক্যাল কর্মী এন কুণ্ডু বলেন, ''দ্রুত আধুনিকীকরণই জলাজমি ক্ষয়ের মূল কারণ। ১৯৪৫ সালে নথিভুক্ত অর্ধেক জলাজমিই আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাকি অর্ধেকও বিলুপ্তের পথে। জলাজমিগুলোর সংরক্ষণের স্বার্থে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এমনকী ব্যক্তিগত ভাবে ১০০টা এফ আই আর করেছি এই বেআইনি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে। উচ্চমহলের প্রভাবের দরুন এখনও অবশ্য কোনও কিছুই ফলপ্রসূ হয়নি।'

ই সি ডব্লু এম-এর ব্যর্থতাকেই প্রমোটারদের বাড়বাড়ন্তের মূল কারণ বলে মনে করছেন পরিবেশবিদদের একাংশ। তাদের মতে, জমির ধারে যদি খুঁটি পুঁতে সীমানা করে দেওয়া যায়, তাহলে প্রমোটারদের দৌরাত্ম্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে।

Swastika
23 August - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

দেমচক একটি ছোট্ট গ্রাম আর নতুন এক সম্ভাবনা

কৈলাশ ও মানস সরোবর

অচিন্ত্য বিশ্বাস

দেমচক জায়গাটার নাম শোনা যায় ২০০৫-এর এপ্রিল মাস নাগাদ। ছোট্ট গ্রাম দেমচক। মাত্র দেড়শো মানুষের বাস। দোসরা আগস্ট ২০০৫-এ 'হিন্দু' পত্রিকায় গ্রামটার কথা লেখেন লুভ পুরী। লাদাখের মানুষ চাইছে দেমচক হয়ে

লে-এর সভায় দাবী

'চলো চলে কৈলাশ কী ঔর'

সংবাদদাতা।। সম্প্রতি কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রাপথ সুগম করার দাবীতে লাদাখের রাজধানী লে-তে এক সভা হয়ে গেছে। গত ২৫ জুন (২০১০) লে-এর প্রধান বাজারের কাছে শঙ্কর গুহার সামনে সকালে এক সভা থেকে দাবী উঠে— 'চলো চলে কৈলাশ কী ঔর'। কৈলাস ও মানস সরোবর হিন্দু-বৌদ্ধসহ সকল ভারতীয়র কাছেই শ্রদ্ধার কেন্দ্র। তাই কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা লে-থেকেই শুরু করা দরকার। কেননা এই পথে খরচ কম এবং রাস্তাও তুলনামূলকভাবে সুগম।

মানস সরোবরের পথ আবার খুলে যাক। এ নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংহ কথাবার্তা শুরু করার পক্ষপাতী। আমাদের মতে এ ব্যাপারে আরও বেশি বেশি উদ্যোগ নেওয়া উচিত। দেমচক গ্রামের অবস্থানটি অদ্ভুত। একদিকে 'আজাদ কাশ্মীর'—পাকিস্তান অধিকৃত ভারতের ভূখণ্ড, অন্যদিকে চীন। আকসাই চীন। এই এলাকার সোয়া সাঁইত্রিশ হাজার বর্গ কি.মি. এলাকা ১৯৫৪ নাগাদ চীন দখল করে নিয়েছে। ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ কাশ্মীরের অন্তর্গত লাদাখের এলাকা ছিল আকসাই চীন। ১৯৬২ চীন-ভারত যুদ্ধে দেমচকের একাংশ চীন দখল করে নিয়েছে। গ্রামের অর্ধেক ভারতে, অর্ধেক দখলদার চীনের অধীন। অবশ্য ভারতের অংশে উন্নতি চোখে পড়ার মতো। শীতল মরুভূমি দেমচকে আছে চব্বিশটি বাড়ি। প্রত্যেক বাড়িতেই জ্বলে সৌর বিদ্যুৎ ও চুল্লী। চীনের অংশে দুটি মাত্র বাড়ি—সেখানে উন্নতি তেমন নজরে পড়ে না।

দেমচক সংবাদের শিরোনাম হবার কারণ এখান থেকে চুমাথাং অঞ্চল হয়ে একটি প্রাচীন বাণিজ্য পথ চলে গেছে সিন্ধু নদীর অববাহিকা ধরে সোজা মানস সরোবর। এই পথটি আর একবার খোলার চেষ্টা শুরু হয়েছে। মানস সরোবর থেকে দেমচক মাত্র ১৯৮ কিলোমিটার। লে থেকে দুর্গতি পর্যন্ত পাকা রাস্তা আছে ৯৮ কিমি। তারপর ১০০ কিমি রাস্তা খারাপ। সেটা সারাই করা দরকার। দুর্গতি থেকে ৬ ঘণ্টা পূর্বদিকে গেলে পাকিস্তান বা চীন অধিকৃত অঞ্চল। তার সীমানা দেমচক। একসময় মূল চীন ভূখণ্ড থেকে এই পথে যেত উটের পিঠে বাণিজ্যজীবীর দল। সেই ক্রমেলক দল এসে পড়ত লাদাখে। তারপর পামিরের দক্ষিণ হয়ে দূর পশ্চিম তথা মধ্যপ্রাচ্যে। ভারতবর্ষের সাধুসন্তের দল যেতেন মানস সরোবর পর্যন্ত। তীর্থ পর্যটনে— যেতেন এদেশ থেকে বহু মূল্যবান মণিমাণিক্য আর দর্শন নিয়ে। ফিরতেন শিলাজতু, সৈন্ধব লবণ সহ অজস্র মণিমাণিক্য আর পুণ্য সঙ্গে করে। এপথ যদি খুলে যায় তাহলে নেপাল হয়ে মানস সরোবর যাত্রার সুগম পথ পরিহার করা সম্ভব হবে। উত্তরাঞ্চল হয়ে কঠিন যাত্রার দরকার পড়বে না। উন্নতি হবে কাশ্মীরের। বিশেষ করে লে-লাদাখের অর্থনীতি ও পর্যটন শিল্পে জোয়ার আসবে।

২০০৫-এর এপ্রিলে চীনের নেতা ওয়েন জিয়াবো ভারতসফরে এসেছিলেন। তাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংহ দেমচক হয়ে মানস সরোবর পর্যন্ত তীর্থ ও বাণিজ্য পথ খোলার অনুরোধ করেন। ওয়েন জিয়াবো নাকি নীতিগতভাবে সম্মতি দিয়েছেন। তারপর সেই সেই করে কেটেছে পাঁচটি বছর। আমাদের ধারণা কূটনৈতিক পর্যায়ে এই উদ্যোগ খানিকটা অগ্রসর হয়েছে নিশ্চয়। হলে ভালো, না হলে আমাদের প্রস্তাব—এ নিয়ে জনমত গড়ে তোলা উচিত।

পিন্টু নারবু লে-র হোটেল ব্যবসায়ী। লাদাখের বিধায়ক নারবু প্রবল উৎসাহী। তাঁর ধারণা এইপথ খুলে গেলে সব পক্ষ লাভবান হবেন। লাদাখ তখন ভারতীয় উপমহাদেশে একটি বড়ো বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। দেমচক-এর রাস্তা খুললে মানস সরোবর যাত্রা সহজ হবে। কারণ গোটা রাস্তাই চড়াই উৎরাই হীন— মোটামুটি সমতল। দেমচক থেকে চীনের (অধিকৃত তিব্বতের) নিকটতম শহর তাসিগং, মাত্র ৩৫ কিমি পূর্বে। চীনের পশ্চিম রাজপথ শুরু হয় তাসিগং থেকে। এরপর চীনের জিনহাং প্রদেশের খনিশহর রুদক। রুদকে আছে সোনার খনি। এই mainly plain route-টি খুলে গেলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়বে নিশ্চয়।

দেমচকের তিরিশ বছরের যুবক নাওয়াং ছোরা এ ব্যাপারে উৎসাহী। তার বলা কথা— চীনা জিনিসপত্র আগে বেশি আসত এখানে। যেত লাদাখে। এখন আসা যাওয়া বন্ধ। সমতল ভূমি থেকে ভোগ্যপণ্য আসে। চীনা জিনিস আসে কেবল চটি আর থার্মাস বোতল। সেই বোতলে পানীয় বহুক্ষণ গরম থাকে। মোটকথা সমস্ত সীমান্ত এলাকার মতোই সস্তা ভোগ্যপণ্যের চাহিদা আছে এখানে। চীন এসব পাঠায় চোরাগোপ্তা পথে। সেসব মুক্ত হলে কতটা ভালো বা মন্দ হবে সে বিবেচনা করে দেখুন সরকার, বণিকমহল। আমরা নাওয়াং ছোরা বা পিন্টু নারবুর সঙ্গে একমত— এই নতুন তীর্থপথটি খোলা হোক।

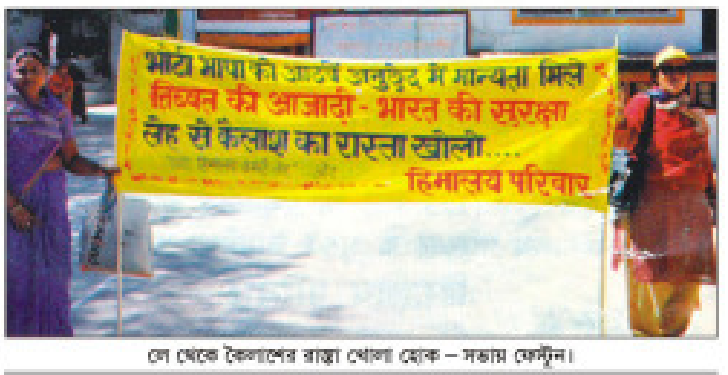

লে থেকে কৈলাশের রাস্তা খোলা হোক – সস্তায় ফেস্টুন।

কূটনৈতিক আর সাংস্কৃতিক বিবেচনা আমাদের মতে আরও গুরুত্বপূর্ণ। অতি দীর্ঘ দিন ধরে কাশ্মীর উপত্যকায় হিন্দু প্রধান জম্মু আর বৌদ্ধপ্রধান লে-লাদাখের প্রতি উপেক্ষার ভাব লক্ষ্য করা গেছে। দেশের মূলধারায় কাশ্মীর-উপত্যকার মুসলমান জনসাধারণকে আনা সম্ভব হয়নি। সে কাজটি করা হোক। শান্তির প্রক্রিয়া চলুক। কাশ্মীরবাসী বুঝুন তারা স্বাধীন হলে কিংবা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে ঘোর বিপদ। গণতন্ত্রহীন আজাদ কাশ্মীর বা উগ্রবাদীদের ঘাঁটি পাকিস্তান যে কিরকম রাষ্ট্র তা তাদের উপলব্ধিতে আসবে নিশ্চয়। তাছাড়া তাদের অর্থনীতির ভিত্তি পর্যটন শিল্প। ভারতীয় পর্যটকরা না গেলে সেই অর্থনীতি ধাক্কা খাবে। তারা এই উপলব্ধিতে আসবে— খুব দেরি হবার কথা নয়। আর একদিকে মহাতীর্থ অমরনাথ আর অন্যদিকে মানস সরোবর— দুই পথের তীর্থযাত্রা যত বেশি বাড়বে তত বেশি করে প্রমাণিত হবে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই কাজটি কাশ্মীর উপত্যকাবাসীর ধারাবাহিক ভারত-বিরোধী মনোভাবটিকে শমীকৃত করতে বাধ্য। কারণ আজকের পৃথিবীতে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড—বিশ্বায়ন পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে আত্মঘাতী সন্ত্রাস বা বিকৃত উগ্রবাদ কখনোই কোন ইতিবাচক ভবিষ্যৎ রচনা করে না। কাশ্মীরের উত্তর আর দক্ষিণ, পূর্ব আর পশ্চিমে ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের প্রাণ প্রবাহ সিন্ধুনদের ঢেউ গুণতে গুণতে, চিনার গাছের পাতা মাড়িয়ে যত বেশি করে যত তাড়াতাড়ি প্রসারিত হয় ততই মঙ্গল। আশা করি চীনও মানস সরোবরকে ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক ভাবে দখলে রাখলেও একদিন ভারত সংস্কৃতির জয় হবে। মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন। আমরা অপেক্ষায় থাকি। মা ভৈ।

স্বস্তিকা
পূজা সংখ্যা -১৪১৭
বিস্ময়ের বাঙ্ময়
উপন্যাস
○ নবকুমার বসু ○ দীপঙ্কর দাস
○ সুমিত্রা ঘোষ ○ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
গল্প ❐ প্রবন্ধ ❐ ছড়াকাহিনী

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম এর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রথেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক : বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ : সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৪০৩, টেলিফ্যাক্স : ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com